সাম্প্রতিক প্রত্ন-গবেষণায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা

এ কে এম শাহনাওয়াজ

সাম্প্রতিক প্রত্ন–গবেষণায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক প্রত্ন-গবেষণায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক প্রত্ন-গবেষণায় বাংলাদেশের
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৪/ফেব্রুয়ারি ২০০৮

বাএ ৪৬৩৬
[অর্থবর্ষ ২০০৭-২০০৮ পাঠ্যপুস্তক : মাসাআবা উপবিভাগ : ৭]

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
মানবিকীবিদ্যা, সামাজিকবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
ড. আবদুল ওয়াহাব
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

মূল্য
একশত কুড়ি টাকা মাত্র

SAMPRATIK PRATNA-GABESHANAY BANGLADESHER SANSKRITIK OITIJYA PUNARGATHANER SAMBHABNA (Possibility for Reconstruction of Cultural Heritage in Bangladesh as Reflected in Recent Archaeological Studies) by Dr. A K M Shahnawaz. Published by Dr. Abdul Wahab, Director (Incharge), Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : February 2008. Price : Tk. 120.00 only.

ISBN 984-07-4645-6

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার শিক্ষক প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ
অধ্যাপক এ এফ সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ
যাঁর স্নেহাশীষ আমাকে পথ দেখায়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাক কথন

প্রায় দেড় যুগ আগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা শুরু হয়েছে এদেশে। সরকারি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গবেষণার কর্মসূচি গ্রহণ করতে না পারলেও সীমিত সাধ্যে প্রত্নসম্পদ অনুসন্ধান, উৎখনন সংরক্ষণ করে আসছে। এতে করে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের পথ তেমন তৈরি হয়নি। কিন্তু গত দেড় দশকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গতানুগতিক কাজের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের গবেষণা এবং প্রত্নসম্পদ অনুসন্ধান, উৎখনন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য-উপাত্তের সন্নিবেশ একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে স্পষ্ট ছিল না যে, নতুন পলিমাটিতে গড়া বাংলাদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগপর্বের অস্তিত্ব ছিল বা পাথর যুগে মানব বসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ভূতাত্ত্বিক গবেষণা নিশ্চিত করেছে, বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের মাটি লক্ষ বছরের পুরোনো। এই তথ্য নতুন গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এগিয়ে চলে। এরই সূত্রে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে পাওয়া গিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথুরে হাতিয়ারের উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার। নরসিংদির উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে প্রাচীন সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার প্রত্নঅঞ্চল হিসাবে এতকাল মহাস্থানগড়, ময়নামতি আর পাহাড়পুর চিহ্নিত ছিল। উৎখনন ও নতুন গবেষণায় যশোরের ভরতভায়না প্রত্নস্থল এখন সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নতুন সংযোজন হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক গবেষণায় মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় নতুন ঐশ্বর্য যুক্ত হচ্ছে। সোনারগাঁও সম্পর্কে যুক্ত হচ্ছে নতুন তথ্য। এখন নতুন করে ভাবতে হচ্ছে ঢাকা নগরীর প্রাচীনত্ব নিয়ে। যশোর-ঝিনাইদহের বারবাজার ও বাগেরহাট প্রত্নঅঞ্চল নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উপস্থাপিত হচ্ছে। রাজশাহীর বাঘায় মধ্যযুগের মুসলিম সংস্কৃতির কিছু প্রামাণ্য তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। প্রচলিত ইতিহাস খোঁজ করেনি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল চিহ্নিত হয়েছে শরিয়তপুরে। এভাবে সাম্প্রতিক প্রত্ন-গবেষণা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের পথনির্দেশনা দিচ্ছে। এসব তথ্য-উপাত্তের সন্নিবেশে এই গ্রন্থের উপস্থাপনা।

গ্রন্থরূপ পাওয়ার একটি প্রেক্ষাপট আছে। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত বাংলা একাডেমী পত্রিকায় (৫০ বর্ষ : তয়-৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৬, পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা) এই লেখাটি প্রবন্ধকারে মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটি অনেক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাঁদের অনেকেই প্রবন্ধটি গ্রন্থরূপ দেয়ার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। বিশেষ করে বাংলা একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. আবদুল ওয়াহাব শুধু উৎসাহিতই করেননি, নিরন্তর তাগিদও দিয়েছেন। আমি কিছুটা পরিমার্জনা করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলো নতুন সংযোজন। আমার ছাত্র বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য বার বার মনে করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে। উয়ারী-বটেশ্বরের কয়েকটি মূল্যবান ছবি সরবরাহ করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে আমার ছাত্র উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নস্থলের উৎখনন পরিচালক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান। প্রেসে পাঠানোর চূড়ান্ত মুহূর্তে বাগেরহাটে আমার তোলা ছবিগুলো খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তখন মনে পড়ল নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিদ্যার মেধাবী ছাত্র মোঃ মাহমুদুর রহমান মাসুমের কথা। প্রত্নস্থল ঘুরে ঘুরে ছবি তোলা ওর নেশা। ওর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ছবি পাওয়ার বাড়তি সুবিধা শিক্ষক হিসাবে আমি বরাবর পেয়ে থাকি। এবারও মাসুম নিরাশ করল না। গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে আমি আমার এই শুভানুধ্যায়ীদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা	১
বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার পটভূমি	১
প্রত্নসূত্র ব্যবহারে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা	৭
বাংলাদেশে প্রাগৈতিহাসিক কালপর্ব	৮
সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য	৯
প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য অনুসন্ধানে নতুন সংযোজন—'প্রত্নস্থল উয়ারী-বটেশ্বর'	১০
ভারতভায়না	১৩
মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য : প্রত্নসূত্রে নতুন সংযোজন	২০
সাম্প্রতিক গবেষণায় সোনারগাঁওয়ের গুরুত্ব	৩১
ঢাকা নগরীর প্রাচীনত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থা	৪০
স্বল্প আলোচিত প্রত্নস্থল বারবাজার	৪৬
প্রত্নস্থল বাগেরহাট : সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ	৪৯
শরিয়তপুরে প্রত্নস্থল শনাক্ত ও বিশ্লেষণ: সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নতুন সংযোজন	৬২
নিঘণ্ট	৮০
আলোকচিত্র	৮১

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইতিহাস চর্চা জীবন্ত জাতির পরিচায়ক। পুরাতাত্ত্বিক উপাদান হচ্ছে ইতিহাস চর্চার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া বস্তু-সংস্কৃতির ভেতর প্রতিবিম্বিত হয় ঐতিহ্যের স্বরূপ। সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ছড়িয়ে থাকে প্রত্নসূত্রে। এ সমস্ত পুরাবস্তু সে যুগের মানুষের রুচি ও দক্ষতার ছবি উন্মোচন করে। পুরাতাত্ত্বিক সম্পদের ভেতর জড়িয়ে থাকে একটি জাতির অহংকার। কোনো জাতি যখন দারিদ্র্য বা অন্য কোনো সংকটে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে তখন উজ্জ্বল ঐতিহ্যই তাকে নতুন জীবনীশক্তি দিতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক যুগপর্ব থেকে শুরু করে প্রাচীন, মধ্য ও ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত নানা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আমাদের প্রচলিত ইতিহাস ও সংস্কৃতিবিষয়ক গ্রন্থগুলোতে এখনো জায়গা করে নিতে পারেনি ঐতিহ্যের সকল সম্ভার। নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহের চিত্র এখনও সকল স্তরের মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়নি। পুরাতাত্ত্বিকগণ কুমিল্লার লালমাই এবং হবিগঞ্জের চুনারুঘাট অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল খুঁজে পেয়েছেন। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক প্রত্নস্থলসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে দেশের নানা অঞ্চলে। এগুলোর মধ্যে পাহাড়পুর বিহার ও ময়নামতি অঞ্চলের বিহারসমূহ অনেকটা পরিচিত হলেও প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু ঐতিহ্য বুকে নিয়ে যশোরে অবস্থিত ভরতভায়না প্রত্নস্থল এখনো সাধারণ্যে সুপরিচিত নয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন প্রত্নস্থল মহাস্থানগড় ইতিহাসের পাদপীঠে চলে এলেও নরসিংদির উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নস্থল এখন নতুন সম্ভাবনার হাতছানি দিচ্ছে। বাংলাদেশ জুড়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংস্কারকৃত এবং ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় রয়েছে মধ্যযুগের মসজিদ, মাদ্রাসা, সমাধি, দুর্গ, প্রাসাদ ইত্যাদি। মধ্যযুগের কয়েকটি নতুন প্রত্নস্থলও আবিষ্কৃত হয়েছে। দেশের নানা স্থানে রয়েছে ঔপনিবেশিক যুগের ইমারত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মন্দির, ধ্বংস-প্রায় বা সংরক্ষিত জমিদার বাড়ি ও অন্যান্য ভবন। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধানে যে সকল আকর সূত্রের ওপর নির্ভর করতে হয় তা প্রধানত এদেশে অনুসন্ধান ও উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র।

বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার পটভূমি

বাস্তবতা হচ্ছে এই যে প্রত্নসূত্রে ঐতিহ্য গবেষণা বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে এদেশে। অতি সাম্প্রতিককালে সীমিতভাবে গৃহীত হচ্ছে এ ধারায় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। তাই বলা যায় বিজ্ঞানমনস্কভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধানে নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উন্মোচনে প্রত্নসূত্র তেমনভাবে ব্যবহৃত না হওয়ার বড় কারণ প্রত্নতত্ত্ব চর্চার সংকট। এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার বিষয়টি দীর্ঘদিন বিবেচনায় আসেনি। প্রত্নতত্ত্ব চর্চার একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রভূমি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের ঐতিহ্য অনুসন্ধানে কর্তৃপক্ষীয় নীতি নির্ধারণী পদক্ষেপ

www.pathagar.com

তেমন একটা গৃহীত হয়নি। অবশ্য ঐতিহ্য খুঁজে ফেরা বা তা সংরক্ষণের বিষয়ে একটি বিশেষ জ্ঞানের শাখা হিসাবে প্রত্নতত্ত্বকে বিবেচনা করার মতো সচেতনতা সৃষ্টি শুধু বাংলাদেশে কেন এই উপমহাদেশে খুব বেশি দিনের নয়। ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়েই বরাবর খোঁজার চেষ্টা চলেছে অতীত ঐশ্বর্যের নির্যাসটি। স্বাভাবিকভাবেই পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে সে উদ্যোগ সফল হওয়ার নয়। অবশ্য জ্ঞানের শাখা হিসাবে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও তেমন প্রাচীন নয়। একটি পদ্ধতি তৈরি করে কিছুটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মাত্র দেড় শতক পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা শুরু হয়।[১] পদ্ধতিগতভাবে ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার গুরুত্ব অনুভূত হয় ষোল শতকে ইলোরা, এলিফেন্টা, কানহেরি প্রভৃতি প্রত্নস্থলের বিশ্লেষণ ও বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পরই। এ সময় উপমহাদেশের মানুষ প্রথম প্রত্নতত্ত্ব বলে জ্ঞানের একটি শাখার অস্তিত্ব অনুভব করে। এতকাল এই প্রত্নস্থলগুলো মানুষকে বিস্মিত করেছে। এর শিল্পিত রূপ জন্ম দিয়েছে অনেক কাহিনীর। শেষ পর্যন্ত চেতনার দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন ইউরোপীয় পর্যটকগণ। তাঁরাই প্রথম লিপিবদ্ধ করেছিলেন এসব প্রত্নস্থলের বিবরণ।[২] এভাবে ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক সাহিত্যের জন্ম হলেও পদ্ধতিগত প্রত্নতত্ত্ব চর্চার জন্য আরো দুই শতক অপেক্ষা করতে হয়। এর মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। ফলে আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে ভারতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার সূচনা ঘটে।

বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার পরিপ্রেক্ষিত আরো অনেক নবীন। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব বাংলায় দুই পর্বে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রত্নসম্পদ অন্বেষণে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং 'আর্কিওলোজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র তৎপরতায় বাংলাদেশের প্রাচীন প্রত্নস্থলগুলো উন্মোচিত হয় সীমিত উৎখনন ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে।[৩] পাকিস্তানি শাসনামলে অন্য সকল বিষয়ের মতোই প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রেও শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে বৈষম্যমূলক আচরণ পায় বাঙালি। প্রত্নতত্ত্ব চর্চা তথা প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিয়ে পাকিস্তানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলেও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিই এর দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকে। তবুও এই পর্বে লালমাই অঞ্চলের প্রত্নসম্পদ উন্মোচিত হয়। মহাস্থানগড়েও অল্প পরিসরে খননকার্য চলে। তবে বাংলাদেশের প্রতি পুরো মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল না পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের। এই বিভাগের আটটি শাখার মধ্যে East Pakistan Circle for Conservation ছাড়া বাকিগুলোর সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।[৪] তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার জন্য বাজেটও ছিল খুব সীমিত।[৫] ফলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে এই অবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। ১৯৭২ সালে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। কাগজপত্রে প্রত্নসম্পদ অনুসন্ধান, উৎখনন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের থাকলেও প্রত্নতত্ত্ব চর্চা বলতে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করা হয় সে সম্পর্কে কোনো নীতি গৃহীত হয়নি। ফলে আধুনিক ও প্রায়োগিক বিষয় হিসাবে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ধারাটি অগ্রসর হতে পারেনি। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায় শিক্ষিত প্রত্নতত্ত্ববিদ সৃষ্টির বদলে 'অভিজ্ঞতায় প্রত্নতত্ত্ববিদ' হওয়ার ক্ষেত্রই বিস্তৃত হতে থাকে। এ কারণে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা এবং প্রত্নবস্তু

www.pathagar.com

আহরণ-অনুসন্ধানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারায় স্বাভাবিক কারণেই এই প্রতিষ্ঠান তেমন সম্পৃক্ত হতে পারেনি।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই অধিদপ্তরটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্র উন্মোচিত হওয়া, ঐতিহ্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার পথ সৃষ্টি করার মতো বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, শুরু থেকেই অনেকগুলো বাস্তব সমস্যা আঁকড়ে ধরেছে অধিদপ্তরটিকে। ফলে লক্ষণীয় গুণগত উন্নয়ন সাধন করার মতো দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশ নতুন পলল ভূমিতে গড়া। তাই এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো অত পুরাতন নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা এই ধারণা পাল্টে দিয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতত্ত্ববিদগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের ভূমিরূপ অনেক প্রাচীন। ভূতত্ত্বের ভাষায় প্লায়োস্টসিন যুগের মাটি। একারণেই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও উৎখননের মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কোনো কোনো অঞ্চলে পাথর যুগের হাতিয়ার পেয়েছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগপর্ব ছিল সাম্প্রতিক গবেষণায় তা এখন স্পষ্ট। লালমাই ও হবিগঞ্জের চাকলাপুঞ্জি (চুনারুঘাট) প্রাগৈতিহাসিক যুগের দুই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে এখন পরিচিত।

খ্রিষ্টপূর্ব যুগেই যে বাংলাদেশে নাগরিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা বগুড়ার মহাস্থানগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার অনেক আগেই আমাদের নিশ্চিত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত উৎখনন কার্যক্রম এ পর্যন্ত যে তথ্য দিচ্ছে তাতে বোঝা যায় খ্রিষ্টপূর্বযুগে এ অঞ্চলেও নগরায়ন হয়েছিল। প্রত্ন আবিষ্কারের বিচারে প্রাচীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার হচ্ছে বৌদ্ধ বিহারসমূহ। নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, সীতাকোট বিহার, কুমিল্লার ময়নামতি অঞ্চলের বিহারসমূহ সাধারণ্যে পরিচিত। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আবিষ্কৃত যশোরের ভরতভায়না প্রত্নস্থল এখনো ততটা পরিচিতি পায়নি। সেখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির বহু নিদর্শন রয়েছে। শুধু স্থাপত্য নয় ভাস্কর্য শিল্প এবং সমকালীন মানুষের ব্যবহার্য বস্তুসংস্কৃতি ঐতিহ্য বিনির্মাণে সাহায্য করে। কিন্তু এসবের পরিচর্যা আমরা তেমনভাবে করতে পারছি না। তবে এ সত্যটি মানতে হবে যে আর কিছু না হোক এসব পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য প্রাচীন বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মধ্যযুগ বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তের শতকের সূচনা থেকে আঠার শতকের মাঝপর্ব পর্যন্ত প্রলম্বিত কালপরিসর বাংলাদেশের মধ্যযুগ হিসাবে চিহ্নিত। এ পর্বে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে রূপান্তর ঘটেছিল। বহির্ভারতীয় মুসলমানদের হাতে বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতা চলে যায়। মাঝে-মধ্যে কিছু সময়ের অসংবদ্ধ শাসনের কথা বাদ দিলে মধ্যযুগকে চিহ্নিত করা যায় দুটি বড় বিভাজনে। একটি দুশো বছরের স্বাধীন সুলতানি শাসনপর্ব এবং অন্যটি মোগল যুগের সুবাদারি শাসন। উভয় শাসনকালেই শাসকশ্রেণীর শাসননীতি ছিল জনকল্যাণমূলক ও অসাম্প্রদায়িক। পাশাপাশি বাংলা ছিল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চল। এর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এ পর্বের পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে। সুলতানি ও মোগল যুগে নির্মিত

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদ পাওয়া গিয়েছে বাংলাদেশ জুড়ে। সংখ্যায় কম হলেও পাওয়া গিয়েছে সমাধি ও মাদ্রাসা স্থাপত্যের নমুনা। মোগল যুগে নির্মিত কিছু লৌকিক ইমারতও পাওয়া গিয়েছে। মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল হিসেবে সোনারগাঁও, বাগেরহাট, রাজশাহীর বাঘা ও চাপাইনবাবগঞ্জ সুপরিচিত হলেও যশোরের প্রত্নস্থল বারোবাজার অথবা হিন্দু সংস্কৃতির ধারক শরিয়তপুরের মনসাবাড়ি এখনো অনেকের কাছে অজানা। মোগল যুগের মসজিদ স্থাপত্যসমূহ, কান্তজীর মন্দির, লালবাগ দুর্গ, বড় কাটরা, ছোট কাটরা সাধারণ পরিচিতি পেলেও জিঞ্জিরা দুর্গ এবং জলদুর্গদ্বয় সর্বসাধারণ্যে তেমন আলোচিত নয়।

আঠার শতকের মাঝপর্ব থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক বাংলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজের অধীনে ছিল। এই কালপর্বের যে সকল পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য উন্মোচিত ও সংরক্ষিত শিল্পকলার দৃষ্টিতে তাতে ব্যতিক্রম ও বৈচিত্র্য ছিল। এদেশে প্রচলিত সুলতানি, মোগল ও হিন্দু স্থাপত্য এবং এসবের অলংকরণ-শৈলীর সঙ্গে যুক্ত হয় ইউরোপীয় ঘরানা। ধর্মীয় স্থাপত্যে মসজিদ, মন্দির ও সমাধির পাশাপাশি গির্জা-স্থাপত্য যুক্ত হয়। প্রাসাদ, দাপ্তরিক ইমারত, বেসরকারি ভবনসহ নানা লৌকিক ইমারত যুক্ত হয় এযুগের স্থাপনায়। অলংকরণ-শৈলীতে আসে পরিবর্তন। কিন্তু আমাদের নানা ধরনের সীমাবদ্ধতায় এসবের ঐতিহ্যিক প্রণোদনা আমরা সকলের সামনে ছড়িয়ে দিতে পারিনি। মোগল যুগের কান্তজীর মন্দিরের গা জড়িয়ে থাকা পোড়ামাটির অপরূপ শিল্পসুষমার গৌরব বৈশ্বিক প্রচার পেয়েছে। কিন্তু পোড়ামাটির শিল্পশৈলীর অসাধারণ কৃতিত্ব ঘোষণা করলেও সুলতানি যুগে নির্মিত রাজশাহীর বাঘা মসজিদ নিয়ে তেমন আলোচনা নেই। অথবা ঔপনিবেশিক যুগে নির্মিত রাজশাহীর পুঁঠিয়া রাজবাড়ির মন্দিরসমূহের স্থাপত্যকলা, বিশেষ করে এর পোড়ামাটির শৈলী কান্তজীর মন্দিরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঙালির এই কৃতিত্বগাথা সাধারণ্যে কতটুকু প্রচার পেয়েছে? সারাদেশ জুড়ে জমিদার, বণিকদের ফেলে যাওয়া বিশ শতকে নির্মিত প্রাসাদসমূহ বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর ও দখলদারদের হাতে পড়ে প্রায়ই এসবের পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বিলুপ্ত হচ্ছে।

পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পূর্বসূরিদের এসব কৃতিত্ব ধরে রাখা জাতীয় দায়িত্ব। গৌরবের ঐতিহ্য একটি জাতির আত্মিক ও মানসিক শক্তি অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। তাকে এগিয়ে যেতে প্রণোদিত করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঐতিহ্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হলেও নানা কারণে তা সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। কখনো সংরক্ষণের নামে যা করা হচ্ছে তাতে নষ্ট হচ্ছে শিল্পমান, নষ্ট হচ্ছে পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্ব। ঐতিহ্য রক্ষা করতে না পারা বা ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে নানা বাস্তবতায়, যেমন–অজ্ঞতার কারণে, অদক্ষতার কারণে, যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত অসাধুতার কারণে, আর্থিক সংকটের কারণে।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্বে স্নাতক-স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান এবং গবেষণার সুযোগ তৈরি হয়। এতকাল এদেশে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকায় পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য দেখাশোনার একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ছিল সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ওপর। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত প্রত্নতত্ত্ববিদ হওয়ার সুযোগ কম

www.pathagar.com

ছিল। অথচ দেশের প্রত্নসম্পদ আবিষ্কার ও সুরক্ষার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত। ফলে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও বিশ্লেষণের অভাব ক্ষতিগ্রস্ত করছে এদেশের প্রত্নসম্পদ। ব্যতিক্রম বাদ দিলে বলা যায় এদেশের সাধারণ মানুষকে প্রত্নসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে তেমন সজাগ করে তোলা হয়নি। তাই প্রত্নসম্পদ রক্ষার বিষয়টি তাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কখনো কখনো প্রত্নসম্পদ রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্তদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত অসাধুতার কারণেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রত্নসম্পদ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রত্নসম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন রক্ষা করতে পারে। কিন্তু প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে একদিকে যেমন প্রত্নসম্পদ চিহ্নিত করতে পারেন না অন্যদিকে প্রত্নসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত নন। এসব নানা সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের দেশে প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণে একটি সংকট রয়েই গিয়েছে।

নানা সংকট ও নৈরাজ্যে নিমজ্জিত জাতিকে নতুনভাবে প্রেরণা দিয়ে উজ্জীবিত করার জন্য প্রয়োজন অতীত ঐতিহ্যের ঔজ্জ্বল্য উপস্থাপন। এ কারণে পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রচলিত ইতিহাস ও ঐতিহ্যবিষয়ক গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশকে সামগ্রিকভাবে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর প্রধান কারণ এই দুই যুগপর্বে বাংলায় সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থ লিখিত হয়নি। সাহিত্যিক সূত্র কখনো কখনো প্রচ্ছন্নভাবে সমকালকে উপস্থাপন করে কিন্তু বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য উন্মোচনে সে পথও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকের আগের ইতিহাস জানার জন্য বেদ তথা বৈদিক সাহিত্যের ওপরই নির্ভর করতে হয়। যদিও তেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তবু প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনেক বিষয় সম্পর্কে বেদের বাণী বিশ্লেষণ করে ধারণা পেতে হয়। যেহেতু ভারতে প্রবেশের সহস্র বৎসর পর আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করেছিল তাই বেদ বিশ্লেষণ করে বাংলা সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার তেমন সুযোগ নেই। মৌর্য (আ. ৩০০ খ্রি. পূ.- ৩০০ খ্রি.) ও গুপ্ত যুগে (৩০০-৫০০খ্রি.) বাংলার কোনো কোনো অংশ এই দুই ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক অঞ্চল রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই পর্বের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার সুযোগ নেই বললেই চলে। আট শতক থেকে এগার শতক পর্যন্ত বাঙালির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলায়। এ পর্বে বৌদ্ধ পাল রাজারা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও তাঁদের তত্ত্বাবধানে কোনো ইতিহাসগ্রন্থ লিখিত হয়নি। এ যুগের ধর্মসাহিত্যগুলোতেও সমাজ জীবনের প্রতিফলন তেমন ছিল না। পালযুগ পর্বের (আট শতকের মাঝপর্ব থেকে এগার শতক) কিছুটা সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের একটি খণ্ডিত ছবি পাওয়া যায় সন্ধ্যাকরনন্দীর *রামচরিত* গ্রন্থে। এছাড়া সমকালীন জীবন খুঁজে পাওয়ার সুযোগ অন্য কোনো সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে পাঁচ শতকে ভারতে আসা চৈনিক পর্যটক ফাহিয়েন এবং সাত শতকে আসা হিউয়েন সাঙ যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে সমকালীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছবি পাওয়া যায়, যার মধ্যদিয়ে প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আংশিক খোঁজ নেয়া সম্ভব। পালদের পতন ঘটিয়ে বাংলার শাসনদণ্ড কেড়ে নেয় সেনরা (এগার শতকের শেষ পর্ব থেকে বার শতক)। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে এসে সেনরা পাল সেনাবাহিনীতে চাকুরি নিয়েছিল। পাল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে তারা ক্ষমতা দখল

www.pathagar.com

করে। এ সময় থেকেই বাংলায় বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারাতে থাকে। সেন বংশের শাসকরা প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন। সেন যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সুযোগ রুদ্ধ হয়ে যায়। বহিরাগত দখলদার শক্তি হিসাবে সেন শাসকরা সম্ভবত নিজেদের ব্যাপারে সতর্ক ছিল। বাঙালির মধ্য থেকে জন-বিক্ষোভের আশঙ্কা করেছে তারা। তাই বাঙালির সম্ভাব্য জাগরণকে প্রতিরোধ করতে সাংস্কৃতিক শূন্যতা সৃষ্টি করতে চাইল। এ কারণে সেন পর্বে সরকারি বিধি-নিষেধে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সেন পর্বে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উন্মোচনকারী বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

তের শতকের শুরুতে বহির্ভারতীয় তুর্কি মুসলমানদের হাতে বাংলার একাংশের শাসন ক্ষমতা চলে আসে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে পুরো বাংলার ওপর মুসলমান শাসকদের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। আরব ভূমিতে ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পর ক্রমাগত মুসলিম বিজয় অভিযান চলতে থাকে। এ পর্বে মুসলমানদের একটি ইতিবাচক সুনাম বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত। তা হচ্ছে মুসলমানরা ইতিহাস সচেতন জাতি। এ অভিধা প্রাপ্তির কারণ হচ্ছে মুসলমান সেনাপতি-শাসকগণ তাঁদের বিজয়গাঁথা লিখে রাখতে উৎসাহী ছিলেন। এ কারণে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক দরবারি ইতিহাস লেখা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলার। বাংলার মধ্যযুগের মুসলিম সুলতান ও সুবাদারগণ এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি।

মোগল যুগে সম্রাটদের মধ্যে দরবারি ইতিহাস লেখার ও লেখানোর প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও স্বাধীন সুলতানি বাংলায় এদিক থেকে নীরবতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুলতানদের অধিকাংশই তেমন পড়াশোনা-জানা ছিলেন না। যে দু-চারজন সুলতান (যেমন–গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ প্রমুখ) জ্ঞান চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায় তাঁরাও ইতিহাস রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন তেমন প্রমাণ নেই। না হলে অন্তত দরবারি ইতিহাস পাওয়া যেত। দরবারি ইতিহাসে জনজীবনের গভীরতা না থাকলেও সমকালের একটি ছবি হয়তো পাওয়া যায়। যার সূত্র ধরে গবেষকদের পথ চলায় সম্ভাবনার কিছুটা আলো হয়তো দেখা দিতে পারত। মধ্যযুগের বাংলার নগর বিন্যাসের কারণ হিসাবে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনের কথা বলা হয়, কিন্তু এ প্রসঙ্গে আলোচ্য যুগের দরবারি ইতিহাস ও সরকারি নথিপত্র না থাকায় বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য করা সম্ভব নয়। অথচ মধ্যযুগে বাংলায় যে নগর বিন্যস্ত হয়েছিল সেটি এখন স্বীকৃত সত্য। কিন্তু এর লিখিত রূপ থাকলে সমকালীন সমাজ ও জীবনের ছবি উপস্থাপন করা সম্ভব হতো। নাগরিক জীবনের পথ ধরে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় খোঁজাও অনেকটা সহজ হয়ে যেত। সমকালীন এ ধরনের সূত্রের অভাবে তাই পরবর্তী কোনো এক যুগের লেখক-গবেষকের ওপর ভরসা করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আবার অন্য এক ধরনের সমস্যা থেকে যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের আলোকে লিখিত এ ধারার গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে গেলে দু ধরনের বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত সংশ্লিষ্ট গবেষকদের অনেকেই বর্তমানের দৃষ্টিকোণ থেকে অতীত খোঁজার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়ত আবেগ তাড়িত হয়ে অতীতকে অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্য দেওয়া বা অবমূল্যায়ন করার প্রবণতা এড়াতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আঠার ও উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসন যুগে ভারতব্যাপী যে অরাজকতা ও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল তার আলোকে ভি. এ. স্মিথের

www.pathagar.com

মতো লেখকগণ প্রাচীন ভারতের জন-মানসের অরাজক ও বিশৃঙ্খল মানসিকতা খোঁজার চেষ্টা করেছেন।[৬]

মস্কো থেকে প্রকাশিত (অনূদিত) 'মানুষের ইতিহাস—প্রাচীন যুগ' (Ancient History, by F. Korovkin) গ্রন্থে এর আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। গ্রন্থটিতে মিশরের পিরামিড নির্মাণ সম্পর্কিত বিষয় আলোকপাত করতে গিয়ে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত আলোচনার প্রয়াস রাখা হয়েছে। পিরামিড নির্মাণে প্রচুর শ্রমশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। লেখক আধুনিককালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত। তাই হয়তো কল্পনা করেছেন প্রাচীন মিশরে শ্রেণী শোষণ ছিল এবং সূত্র মতো শোষিত দাসশ্রেণী একসময় ফারাওদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।[৭] অথচ সমকালীন ইতিহাসের সাক্ষ্যে দেখা যায়, সে যুগে দাসরা মালিকের ইচ্ছের পণ্য হিসাবে নিজেদের ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। ফারাও যুগের বহুকাল পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৭০-৭১ অব্দের দিকে রোমে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে সংঘটিত দাস বিদ্রোহের আগে সংগঠিত দাস বিদ্রোহের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এছাড়াও অতীতের কোনো বিশেষ অধ্যায়কে অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্য প্রদান বা ইচ্ছাকৃত অবমূল্যায়নের জন্য ঐতিহাসিক সূত্রের অবলম্বন ছাড়া মন্তব্য উপস্থাপনের মতো স্বেচ্ছাচারিতার উদাহরণও আছে। ষোল শতকে সংঘটিত শ্রী চৈতন্যের নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনের কারণ খুঁজতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার[৮] ও ড. অতুল সুর[৯] মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও হিন্দু দলনের কাহিনী উপস্থাপন করেছেন যার স্বপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। বরঞ্চ সমকালীন সাহিত্যে এর বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায়। পাশাপাশি ভারতে ইসলামের আবির্ভাব ও সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী যুগে গোঁড়া উলেমাদের লেখা ইতিহাস গ্রন্থ দেখা যায়। এ সমস্ত গ্রন্থেও ঐতিহাসিক সত্যতার বদলে ধর্মের নামে কুসংস্কার, হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ, সুলতানদের বিজয় কাহিনী ও স্তব-স্তুতি দিয়ে পৃষ্ঠা ভরেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একদিকে দরবারি ইতিহাস ও নথিপত্রের অনুপস্থিতি এবং অন্যদিকে পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাস গ্রন্থে সূত্র প্রমাণবিহীন বিশ্লেষণ বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনকে জটিল করে তুলেছে। ইতিহাস চর্চার সূত্র-সংকট এই বাস্তবতাকে স্পষ্ট করছে যে, প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ ছাড়া বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠন সম্ভব নয়।

প্রত্নসূত্র ব্যবহারে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব একটি স্বাধীন বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়নি অনেককাল। এদেশের ঐতিহ্য অনুসন্ধান, সংস্কৃতি বোধ সৃষ্টির দায়িত্ব নিজস্ব সীমাবদ্ধতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগগুলো পালন করে আসছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রত্নতত্ত্ববিদ বা প্রত্নতত্ত্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ গবেষক তৈরি হয়নি। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এদেশে উচ্চ শিক্ষার একটি বিষয় হিসাবে প্রত্নতত্ত্বের যাত্রা শুরু হয়। এ সময় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে প্রত্নতত্ত্ব পঠন-পাঠনের সূচনা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে ইতিহাস বিভাগের অধীনে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রত্নতত্ত্ব ছিল একটি স্বতন্ত্র শাখা। পরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। গত দেড় দশকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর

www.pathagar.com

পর্যায়ে পাঠদান ছাড়াও বাংলাদেশের প্রত্ন-ঐতিহ্য অনুসন্ধানে এই বিভাগের গবেষণা নতুন সম্ভাবনা যুক্ত করেছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি না হওয়ায় এতকাল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে আকর সূত্র হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র বিশদভাবে ব্যবহার করা যায়নি। ফলে এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যে ছবি সাধারণ পাঠকের সামনে উপস্থিত তা অনেকটাই খণ্ডিত। আকর সূত্র সংগ্রহ ও গভীর বিশ্লেষণের অভাবে ঐতিহ্য উপস্থাপনে অসম্পূর্ণতা রয়ে গিয়েছে। এ কারণে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের আয়োজন করতে হয়। সাম্প্রতিককালে প্রত্ন-সূত্র অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে যে অনুদ্ঘাটিত ইতিহাস যুক্ত হচ্ছে তাতে ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের।

বাংলাদেশে প্রাগৈতিহাসিক কালপর্ব

বাংলাদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব বসতি ছিল কি না, এ পর্বে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডার শূন্য কি না—এ বিতর্ক পুরোনো। ভূমি গঠনের বিবেচনায় বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের মাটি বেশ নবীন। পলিমাটিতে গড়ে উঠেছে এই সেদিন। এদেশের ছোট বড় অনেক নদী উচ্চভূমি থেকে বয়ে আনে প্রচুর পলি। এসব পলি সঞ্চয়ে নিম্নভূমিগুলো ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। বলা হয়ে থাকে বাংলার পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ ছাড়া সবটুকু ভূমিই নতুন পলল ভূমি (New Alluvium)। বাংলার ভূমিরূপ নবীন বলে দীর্ঘদিন থেকে মনে করা হতো এখানে খুব প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১০] ঐতিহাসিক যুগ অতিক্রম করে আরো প্রাচীন ঐতিহ্য আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে পুরো বাংলা না হলেও এদেশের কোনো কোনো অংশের মাটি অনেক প্রাচীন। প্লায়স্টোসিন যুগে গঠিত হয়েছিল।[১১] বাংলাদেশের ভূখণ্ড বিচারে উত্তরের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যাঞ্চলের মধুপুরের গড়, এবং পূর্বদিকে লালমাই, চট্টগ্রাম ও সিলেটের মাটি লক্ষ বছরের পুরোনো অর্থাৎ প্লায়স্টোসিন যুগে গড়া। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এ সমস্ত অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের বিচরণ ছিল।[১২] পৃথিবীতে মানুষের ক্রমবিকাশের প্রাথমিক ধারায় ভারত উপমহাদেশে আদি মানবের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পাওয়া গিয়েছে পুরোপলীয় বা পুরোনো পাথর যুগের বেশ কিছু সংখ্যক হাতিয়ার। এগুলোর মধ্যে শিকারের অস্ত্র, হাতুড়ি, কাটা-ছিলার উপযোগী হাতিয়ার ইত্যাদি অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের বিচরণ ছিল আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার তার প্রমাণ বহন করছে। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রথম প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ব্যবহার করা অস্ত্র পাওয়া যায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে। ফসিল কাঠে তৈরি নতুন পাথর যুগের একটি বাটালি পাওয়া গিয়েছে এখানে। এভাবে ধীরে ধীরে পুরোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের হাতিয়ার পাওয়া যায় নোয়াখালীর ছাগলনাইয়ায়, কুমিল্লার লালমাইয়ে, নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে। অতি সম্প্রতি হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে (চাকলাপুঞ্জি) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাথর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। এই আবিষ্কার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কয়েকজন গবেষকের সাম্প্রতিক গবেষণার ফসল।[১৩]

www.pathagar.com

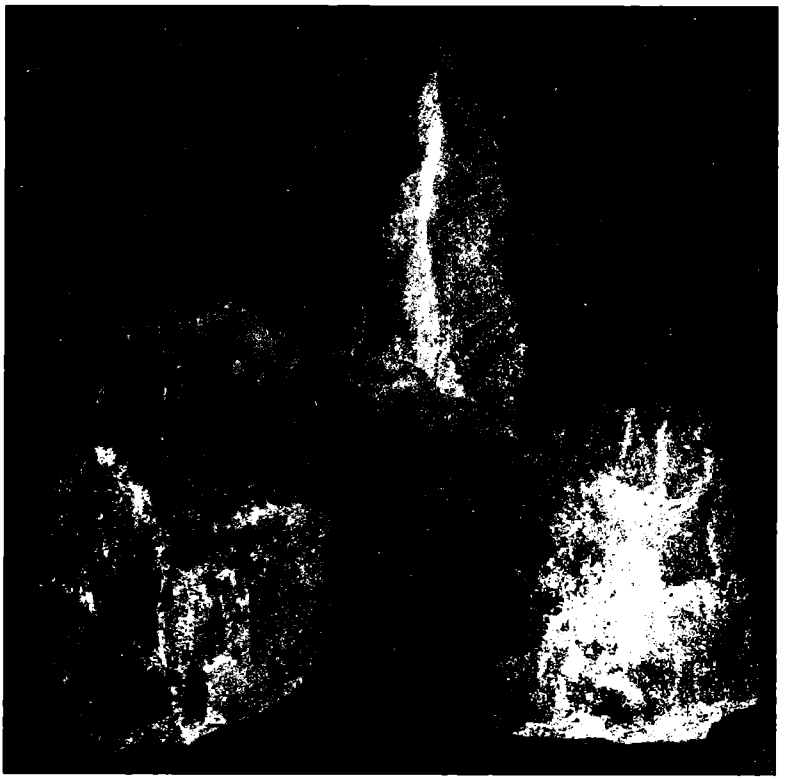

চিত্র-১: প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতিয়ার

এমনি করে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার মধ্যদিয়ে যে ছবি ভেসে উঠেছে এবং ক্রমে আরো দৃশ্যমান হচ্ছে তাতে দেখা যায়, এ ভূখণ্ডে মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অতীত অনেক পুরোনো। ধারণা করা হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় ত্রিশ হাজার বছর আগে থেকে মানুষের বিচরণ ছিল। দক্ষিণ এশিয়া তাই পুরোপলীয়, নবোপলীয় এবং তাম্র-প্রস্তর যুগের ঐতিহ্যে উজ্জ্বল। এই অহংকার থেকে বাদ দেওয়া হতো বাংলাকে। নবীন ভূমিরূপের ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এ অঞ্চলে বড়জোর পাঁচ-সাত হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্যেরই সাক্ষাৎ মিলবে। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার পাল্টে দিয়েছে সে ধারণা। সম্পূর্ণ বাংলাদেশ না হলেও এর কোনো কোনো অঞ্চল যে দক্ষিণ এশিয়ার আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা পড়েছে একথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই।[১৪]

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত প্রামাণ্য সূত্র থেকে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাতে গোটা

www.pathagar.com

বাংলার প্রতিচ্ছবি নেই। হিউয়েন সাঙ সমতট অঞ্চলে ৩০টি সংঘারাম প্রত্যক্ষ করার দাবি করেছেন। কিন্তু এর অধিকাংশ এখনও উন্মোচিত হয়নি। সেন যুগের রাজধানী বিক্রমপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রায় পুরোটাই অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে। শুধু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সূত্রের তথ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। একই মন্তব্য করা যায় প্রাচীন সোনারগাঁওয়ের ক্ষেত্রে। ভূ-প্রাকৃতিক বাস্তবতায় অনেক প্রত্নস্থল এখন আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। দুর্বল নির্মাণ-উপকরণ, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিকম্প প্রভৃতির কারণে বিস্তারিত প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কারের সুযোগ সীমিত হয়ে গিয়েছে। এছাড়া এদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক

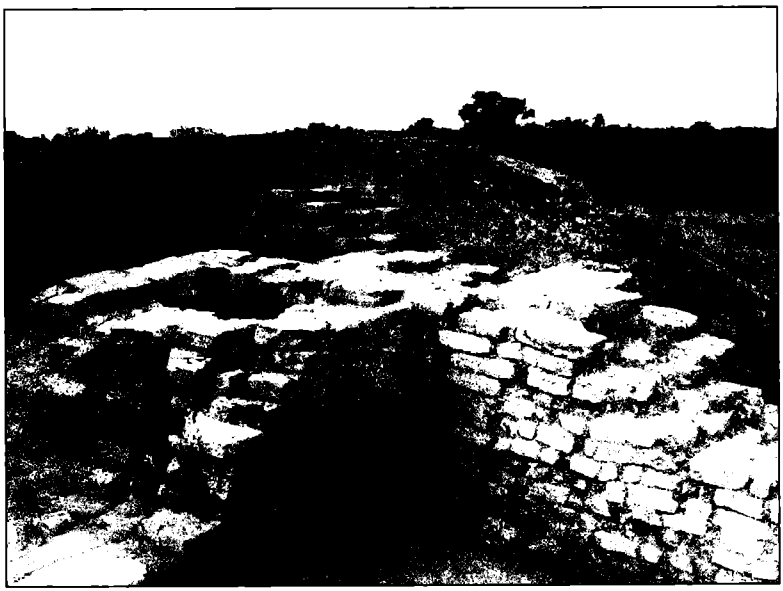

চিত্র-২: উৎখননকৃত ভারতভায়না ঢিবির একাংশ

উৎখননের একমাত্র আইন সম্মত অধিকর্তা সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নানা সীমাবদ্ধতার জন্য কার্যক্রম বিস্তৃত করতে পারছে না। এসব কারণে প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেকটাই অনুদ্ঘাটিত রয়ে গিয়েছে। উৎখননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত প্রাচীন বাংলার উজ্জ্বল প্রত্নক্ষেত্রসমূহ মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর এবং ময়নামতির মধ্যেই সীমিত। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হলে আরো অনেক প্রত্নস্থল আবিষ্কার যে সম্ভব তা নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর ও যশোরের ভরতভায়না প্রত্নস্থল আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য অনুসন্ধানে নতুন সংযোজন–'প্রত্নস্থল উয়ারী-বটেশ্বর'

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও উৎখননের মধ্যদিয়ে প্রত্নস্থল উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠনে এক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নরসিংদী জেলার বেলাব থানা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত দুটি গ্রাম উয়ারী ও বটেশ্বর।

www.pathagar.com

বিশ শতকের ত্রিশের দশকেই নিভৃত গ্রাম দুটো প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা সীমিতভাবে সংস্কৃতি অনুসন্ধানী মানুষের নজরে আসে। এসময় স্থানীয় মানুষ জমি চাষ করতে গিয়ে, পুকুর কাটতে গিয়ে, বৃষ্টি-বন্যা প্রভৃতিতে ভূমি ক্ষয়ের কারণে উয়ারী-বটেশ্বর এবং আশেপাশের গ্রামে অনেক প্রত্ননিদর্শন পেতে থাকে। এই নিদর্শনসমূহের মধ্যে কাচের পুঁতিগুলো বিশেষ গুরুত্ব ধারণ করছে। নানা রং ও আকারের পুঁতি পাওয়া গিয়েছে এখানে। প্রাপ্ত পুঁতির মধ্যে সবুজ, লাল, কালো, কমলা, নীল রংয়ের প্রাধান্য বেশি। সাদা রঙের ভিত্তির ওপর নীল ও কমলা ডোরাকাটা অলংকৃত পুঁতিগুলো বিশেষ আকর্ষণীয়। ভারত ও থাইল্যান্ডের অনেক প্রত্নক্ষেত্রে এ ধরনের পুঁতি পাওয়া গিয়েছে। উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত এসব প্রত্নবস্তু ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে ইট নির্মিত স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ, প্রত্নক্ষেত্রের একপাশে মাটির প্রাচীরের নমুনা, প্রাচীরের বাইরে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কাটা পরিখা। এসব নিদর্শন দেখে গবেষকদের ধারণা উয়ারী-বটেশ্বরে এক সময় নগরায়ন ঘটেছিল।[১৫] এই প্রত্নস্থলে পাওয়া পোড়ামাটির মৃৎপাত্রের গঠন-বৈশিষ্ট্য দেখে অনুমান করা যায় আদি ঐতিহাসিক যুগে এখানে মানব বসতি ছিল। প্রথম বসতি বা নগরায়নের কাল নির্ণয়ের জন্য উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নস্থলের কিছু নমুনার কার্বন-১৪ পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় এখানে নগরায়ন ঘটেছিল ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।[১৬] এই সিদ্ধান্ত বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের সম্ভাবনা স্পষ্ট করছে। এতকাল বাংলার ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে এই ভূখণ্ডে প্রাচীনতম নগরটি গড়ে উঠেছিল বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে। এলাকাটি মৌর্য শাসনযুগে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল। এই ভুক্তির রাজধানী পুণ্ড্রনগরের অবস্থান ছিল বর্তমান মহাস্থানগড়ে। সময়ের বিচারে এখানে নগরায়ন ঘটেছিল আনুমানিক ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। ফলে বাংলার ইতিহাস পুনর্লিখনের মাধ্যমে এর পরে হয়তো বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রাচীনতম নগরের নাম পুণ্ড্রনগরের বদলে উয়ারী-বটেশ্বর লিখতে হবে। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন হবে আরো বিস্তারিত গবেষণা। ইতোমধ্যে কিছু যুক্তি গবেষকগণ উপস্থাপন করেছেন যা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করবে। প্রাচীন মিশরীয় পণ্ডিত টলেমি গাঙ্গেয় উপকূলের বেশ কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছিলেন। এর একটির নাম লিখেছিলেন 'সৌনাগড়া'। সৌনাগড়ার অবস্থান নিয়ে গবেষকগণ ভেবেছেন। টলেমির গ্রন্থের টীকাকার এম. সেইন্ট মার্টিন মনে করেন সুবর্ণগ্রাম উচ্চারণ করতে গিয়েই সৌনাগড়া উচ্চারিত হয়েছে। সুলতানি আমলে বাংলার অন্যতম রাজধানী সোনারগাঁও সুবর্ণগ্রামেরই পরবর্তী রূপ। তবে গবেষকদের বিচারে সৌনাগড়ার সঙ্গে সুবর্ণগ্রামকে মেলানোয় সমস্যা আছে। কারণ টলেমির সময়কাল খ্রিষ্টীয় দুই শতকের মধ্যভাগ। মুসলিম অধিকারের পূর্বে সেন শাসনযুগে অর্থাৎ বার থেকে তের শতকের মধ্যে সুবর্ণগ্রাম নামে পরিচিত সোনারগাঁও একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। এই বিবেচনায় টলেমির সময়কালের সৌনাগড়াকে সুবর্ণগ্রামের সঙ্গে মেলানো সম্ভব নয়। তাই মনে করা হয় টলেমির সৌনাগড়া প্রাচীন বাণিজ্যিক নগর উয়ারী-বটেশ্বর হতে পারে। এই ধারণার পেছনে যুক্তি হচ্ছে এই প্রত্নস্থলে পাওয়া একবর্ণিল কাচের পুঁতির সঙ্গে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কাচের পুঁতির মিল রয়েছে। তাছাড়া টলেমির সময়কালের অনেক আগেই এখানে নগরায়ন হয়েছিল। নদী কেন্দ্রিকতা এখানে বহির্বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করতে পারে।[১৭] অবশ্য এসব যুক্তি

www.pathagar.com

প্রমাণিত হবে কিনা তা নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ গবেষণার উপর। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মধ্যদিয়ে ক্রমাগত উয়ারী-বটেশ্বর তার ঐতিহ্যের ভাণ্ডার উন্মোচন করছে। ২০০৫-২০০৬-এর শীত মৌসুমে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন এক নতুন দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। এর আগের মৌসুমে প্রত্নস্থলটিতে একটি প্রাচীন রাস্তা উন্মোচিত হয়েছিল। ইটের খোলামকুচি ও ভাঙ্গা মৃৎপাত্রে চুনের মিশ্রণ ঘটিয়ে ঢালাই করা রাস্তা সদৃশ ১৮ ফুট লম্বা স্থাপনাটি প্রকৃত অর্থে রাস্তা কি-না তা নিয়ে কোনো কোনো পণ্ডিত বিতর্ক তুলেছিলেন।

চিত্র-৩: উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃতপাত্রের টুকরো

কিন্তু এবারের উৎখননে উন্মোচিত হয়েছে উল্লিখিত রাস্তাটির বিস্তার। মাঝখানে উঁচু ঢিবি থাকায় ৪০ ফুটের মতো ছেড়ে দিয়ে একই সমান্তরালে উৎখননের পর রাস্তার বিস্তার পাওয়া গিয়েছে। আগের ১৮ ফুটসহ ঢিবিতে অন্তরীণ অংশটুকুতে স্বাভাবিক-ভাবেই রাস্তার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে এ পর্যন্ত রাস্তার বিস্তার ১৬০ ফুট। পরবর্তী মৌসুমের উৎখননে এই বিস্তার আরো প্রলম্বিত হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। মজার বিষয় হচ্ছে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই রাস্তা থেকে পশ্চিম দিকে একটি গলি পথও বেরিয়ে গিয়েছে। পরিখার পাশে নগর দেওয়াল থেকে নগরের অভ্যন্তরে রাস্তাটি প্রবেশ করেছে বলে ধারণা করা যায়। এই আবিষ্কার নগরায়নের ধারণা যেমন স্পষ্ট করে তেমনি বাণিজ্য নগরী ভাবার পক্ষেও তৈরি করে যুক্তি। কারণ নদীপথে দ্রব্যসামগ্রী নগরের ভেতর আনা-নেয়ার জন্য এই রাস্তাটির বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে। এভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠনের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

www.pathagar.com

ভরতভায়না

ভরতভায়না প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায়ের বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং সমকালীন প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা বাংলাদেশের একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব উপস্থাপনের পথ তৈরি করে দিয়েছে।

ভরতভায়না প্রত্নস্থলটির অবস্থান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় ভরতভায়না নামের একটি ছোট্ট গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামটি গৌরিঘোনা ইউনিয়নের অন্তর্গত। ভরতভায়না প্রত্নস্থলের পূর্বদিক দিয়ে বহমান বুড়িভদ্রা নদী। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষিত প্রত্নস্থলটি একটি একক বিচ্ছিন্ন ঢিবি। 'ভরতভায়না ঢিবি' বা স্থানীয়ভাবে 'ভর্তের দেউল' নামে পরিচিত এই ঢিবিটিকেই সাধারণভাবে ভরতভায়না প্রত্নস্থল বলে শনাক্ত করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রথম ১৯৮৫ সালে এই ঢিবি উৎখনন করে। এক দশক পর ১৯৯৫-৯৬ সালে পুনরায় এখানে উৎখনন করা হয়। এর ভেতর ১৯৯৬-৯৭ সাল বাদ দিয়ে ২০০০-২০০১ পর্যন্ত প্রতি মৌসুমে এখানে খননকার্য অব্যাহত থাকে। এই ঢিবিটিকে কেন্দ্র করে গোটা ইউনিয়নে সম্প্রতি আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পরিচালনা করেছি। তাতে প্রাচীন বসতির প্রমাণ মিলেছে অনেকটা এলাকা জুড়ে। এর মধ্যে ভরতভায়না ঢিবি ছাড়াও দুটি প্রত্নস্থল স্পষ্টই চিহ্নিত করা গিয়েছে। এর একটি 'ডালিঝরা' আর অন্যটি 'ভরত রাজার বাড়ি'।

চিত্র-৪: ভরতভায়না ঢিবি

ভরতভায়না ঢিবি সম্পর্কে সামান্য লিখিত তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানে ঢিবিটি চারপাশের ভূমি সমান্তরাল থেকে প্রায় ১২.২০ মিটার উঁচু। স্থানীয় প্রবীণদের মতে ১৮৯৭-এর ভূমিকম্পের আগে ঢিবির উচ্চতা আরো অনেক বেশি ছিল। সতীশ চন্দ্র মিত্র

www.pathagar.com

তাঁর *যশোর খুলনার ইতিহাস* গ্রন্থে ঢিবির উচ্চতা বলেছেন ৫০ ফুট। তিনিও ভূমিকম্পে অনেকটা দেবে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সতীশ চন্দ্রের বর্ণনা অনুযায়ী স্তূপটি ছিল অনেকটাই গোলাকৃতির। উত্তর-পূর্ব ও পূর্বদিকে নদী প্রবাহিত। বাকি তিন দিকে রয়েছে গড়খাই।[১৮] বর্তমানে এই গোলাকৃতি ঢিবিটির ব্যাস প্রায় ২৫০ মিটার। ঢিবিটি গবেষকদের নজরে এসেছিল অনেক আগেই। Archaeological Survey of India ঢিবিটিকে সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসে ১৯২২ সালে। প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান কে. এন. দীক্ষিত। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী এখানে পাঁচ শতকে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। দীক্ষিত তাঁর জরিপ কাজ চালিয়ে ছিলেন ১৯২২-২৩ সালে। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী ঢিবিটির বেড় ৮০০/৯০০ ফুট এবং এর উচ্চতা ৪০/৫০ ফুট। তিনি ইটের পরিমাপ দেখিয়েছিলেন ১৬"X১৩"X৩"। দীক্ষিত মন্তব্য করেন হিউয়েন সাঙ সমতট অঞ্চলে যে ৩০টি সংঙ্ঘরাম দেখেছিলেন এই মন্দিরটি তার অন্যতম।[১৯]

গৌরিঘোনা ইউনিয়নের কাশিমপুর গ্রামে আরেকটি প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। ডালিঝরা নামে পরিচিত এই অনুচ্চ ঢিবির অভ্যন্তরে অন্তরীণ আছে প্রাচীন ইট, ইটের কাঠামো ও মৃৎপাত্রের অসংখ্য ভাঙ্গা টুকরো। এখানে পাওয়া গোটা ইটের পরিমাপ ৮.২৫"X৭.৪৫"X১.৭৫" এবং ১২"X৭"X২"। উল্লেখ্য ভরতভায়না ঢিবির ইটের তুলনায় এখানকার ইট কিছুটা ছোট আকারের। অবশ্য ভরতভায়না ঢিবিতে মিশ্র আকারের ইটও পাওয়া গিয়েছে। পূর্বে মূল ঢিবিটি উঁচু থাকলেও বর্তমানে মাটি কেটে প্রায় সমান করে ফেলা হয়েছে। ডালিঝরা প্রত্নস্থলটি ভরতভায়না ঢিবি থেকে আনুমানিক দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে পাওয়া গিয়েছে ভরতভায়না ঢিবির অনুরূপ ইটের আস্তরণ, খোদাই করা সূর্য আকৃতির ইট এবং নানা আকৃতির ভগ্ন মৃৎপাত্র। নির্মাণ-উপকরণ ও পরিপার্শ্ব থেকে অনুমিত হয় 'ভরতের দেউল' তৈরির পর অবশিষ্ট উপকরণ দিয়ে ডালিঝরার বসতি নির্মাণ করা হয়। ডালিঝরা নামকরণ নিয়ে স্থানীয় জনশ্রুতি এই অনুমানেরই সমর্থন দেয়। জনশ্রুতি মতে ভরতের দেউল নির্মাণের পর নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের 'ডালি' বা টুকরি থেকে অবশিষ্ট নির্মাণ উপকরণ এখানে ঝেড়ে ফেলে। সেই থেকে এলাকার নাম হয় ডালিঝরা। ভরতভায়না ঢিবি ও ডালিঝরা সতীশ চন্দ্র মিত্র উল্লিখিত গড়খাই বা পরিখার বেষ্টনীর ভেতর অবস্থিত।

ভরতভায়না ঢিবি থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দক্ষিণে বিস্তৃত বাঁশ বাগান ঘিরে রেখেছে একটি প্রত্নস্থল। গৌরিঘোনা গ্রামে রূপচাঁদ কুণ্ডুর বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বে এই প্রত্নস্থলটির অবস্থান। এই গ্রামের কাছাকাছি বুড়িভদ্রা নদী একটি সুন্দর বাঁক নিয়েছে। প্রচুর ইট, পাথর ও পোড়ামাটির টুকরো ঘোষণা করছে এ স্থানে প্রাচীন মানব বসতির অস্তিত্ব। শুধু বাঁশ নয় বড় আয়তনের এই প্রত্নস্থলটি বড়ই, নিম ও কদম গাছে পূর্ণ। বিভিন্ন সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে এখানে স্থানীয় মানুষ ইটের ভিত্তি ও দেওয়ালের অংশ পেয়েছেন। প্রত্নস্থলের ইট গ্রামের অনেকেই নিজেদের ঘর তৈরিতে ব্যবহার করেছে। এই স্থানে সাধারণ ও কুলুঙ্গিযুক্ত অলংকৃত ইট পাওয়া গিয়েছে। সাধারণ ইটের পরিমাপ ১০.২৫"X৬.৭৫"X২"। কুলুঙ্গিযুক্ত ইটের পরিমাপ হচ্ছে ৯.৭৫"X৯"X২.৭৫"। ইটে যুক্ত কুলুঙ্গির পরিমাপ ২"X২.৫"X২"। প্রত্নস্থলের মাটি কাটতে গিয়ে চার-পাঁচ বছর আগে বড় আকৃতির দুটি পাথরখণ্ড পাওয়া গিয়েছে। পাথর দুটির একটি পার্শ্ববর্তী জনৈক ফজল আলীর ঘরের দাওয়ায় সিঁড়ি হিসাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে আর অন্যটি রাখা

www.pathagar.com

হয়েছে প্রতিবেশী হাফিজুর সর্দারের ঘরের দাওয়ায়। একটির পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২´৭" প্রস্থ ১১" এবং উচ্চতা ২´৭"। এই পাথরটির ডান দিকে তিনটি সিঁড়ির ধাপ খোদিত আছে। অন্য পাথরটির পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২´৮" প্রস্থ ১´২" এবং মাঝের উচ্চতা ৭"। এই পাথরটির দুই প্রান্তে সিঁড়ির ধাপ রয়েছে। বাম পার্শ্বে খোদিত সিঁড়ির ধাপের দৈর্ঘ্য ১´২" এবং ডান পার্শ্বের সিঁড়ির ধাপের দৈর্ঘ্য ৪"। এছাড়াও উল্লিখিত প্রত্নস্থল থেকে আরো দুটি আকর্ষণীয় পাথরখণ্ড পাওয়া গিয়েছে। এর একটি কৃষ্ণ বর্ণের বেলে পাথর। এর পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২´২" প্রস্থ ১´৬.৫" এবং উচ্চতা ১´। এটি কোনো প্রস্তর স্তম্ভের পাদপীঠ হতে পারে। অন্য পাথরটি একটি কুমির ভাস্কর্যের একাংশ। এর পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৫´৬" প্রস্থ ১´৫" এবং উচ্চতা ২´ (বর্তমানে এটি গৌরিঘোনা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস সংলগ্ন মসজিদের সামনে রয়েছে)। অনুমান করা যায় সম্পূর্ণ অবস্থায় কুমির ভাস্কর্যের পরিমাপ ছিল ৪৫৭X৪৩X৬১ সে.মি.। ভাস্কর্যটি কোনো সিঁড়ির পাশে অথবা তোরণ প্রাচীরের উপরিভাগে বসানো থাকতে পারে বলে আমাদের ধারণা। স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য অনুযায়ী এই প্রত্নস্থল থেকে এক সময় একটি সুদৃশ্য পাথরের সিংহাসন পাওয়া গিয়েছিল। পরে তা পাচার হয়ে যায়। এই কথিত রাজবাড়ির সামনের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে নদী এবং অন্য তিনদিকে গড়খাই থাকার প্রমাণ এখনও লক্ষ করা যায়। স্থানীয় জনসাধারণ বিশ্বাস করে এখানে এক সময় ভরত রাজার বাড়ি ছিল। তবে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন পরিচালিত না হওয়ায় বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ নেই।

প্রাচীন বসতি ও স্থাপনার গুরুত্ব নির্ধারণে একটি আবশ্যিক নিয়ামক পরিখা বা গড়খাই থাকা বা না থাকা। একই ইউনিয়নে উল্লিখিত তিনটি প্রত্নস্থলের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর সতীশ চন্দ্র মিত্রের ভরতভায়না ঢিবির তিনপাশে গড়খাই থাকার সিদ্ধান্তটি সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সামগ্রিকভাবে প্রত্নঅঞ্চলটির চরিত্র বিচারে এই গড়খাইটি চিহ্নিত করা জরুরি ছিল। কারণ উল্লিখিত তিনটি প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক নিদর্শনের মধ্যে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভরতভায়না ঢিবি ও ডালিঝরায় কাছাকাছি সময়ে বসতি গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে ভরত রাজার বাড়ি প্রত্নস্থল তুলনায় অনেকটা নবীন। শেষ প্রত্নস্থলটি যদি গড়খাইয়ের বাইরে হয়ে থাকে তবে গৃহীত সিদ্ধান্তের পক্ষে জেরালো যুক্তি দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এই অনুসন্ধানের যাত্রাপথে প্রথম হোঁচট খেতে হয়েছে *বাংলাপিডিয়াতে* ভরতভায়না (যদিও বাংলাপিডিয়ার বাংলা সংস্করণে *ভরতভায়নাকে ভারত ভায়না* লেখা হয়েছে) সংক্রান্ত ভুক্তি[২০] পাঠ করতে গিয়ে। ভুক্তির লেখক প্রত্নস্থলে উল্লিখিত পরিখার চিহ্ন দেখতে পাননি বলে জানিয়েছেন। অভিন্ন লেখক একই ধারণা প্রকাশ করেছেন গবেষণা জার্নাল *Man and Environment*-এ।[২১] বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের তত্ত্বাবধানে গৃহীত গবেষণার অংশ হিসাবে ১৯০৫-এর ৪ জানুয়ারি প্রথম ভরতভায়না অঞ্চলে প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ পর্যায়ে সম্ভব হয় গড়খাইয়ের অস্তিত্ব অস্পষ্টভাবে শনাক্ত করা। এরপর একই বছর ১০-১৩ মার্চ পর্যন্ত বিস্তারিত অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শেষ পর্যন্ত অনেকটা নিশ্চিতভাবেই শনাক্ত করা সম্ভব হয় গড়খাইয়ের অস্তিত্ব।

তিনটি প্রত্নস্থলকে পাশে রেখে দক্ষিণদিক থেকে পূর্বদিকে বয়ে যাওয়া বুড়িভদ্রা নদীর এক কালের খাত 'জাহাজ ডুবি' নামের চর সদৃশ স্থানকে ঘিরে রেখেছে একটি নিম্নভূমি ও জলাশয়। স্থানীয়ভাবে এটি 'মাইধির বিল' নামে পরিচিত। উল্লিখিত

www.pathagar.com

গবেষণায় আলোচ্য গড়খাই বলে যে খাতটিকে অনুমান করা হয়েছে তা এই মাইধির বিলের সর্ব উত্তর অংশ থেকে শুরু করে সামান্য বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে যুক্ত হয়েছে 'ডাঙ্গি'র বিলের সঙ্গে । বর্তমানে এই খাতকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেছে চুকনগর–সোলগাতি সড়ক। এখন গড়খাইটি ধানি জমিতে পরিণত হলেও একটু সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালে সাধারণ ভূমিরূপ থেকে এটি যে কিছুটা অবতল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভালোভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এই নিচু ভূমিরূপটি তিনদিক থেকে ভরতভায়না ঢিবি ও ডালিঝরা ঢিবিকে বেষ্টন করে আছে। সতীশ চন্দ্র এরই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁর গ্রন্থে। এই পরিখা অতিক্রম করে দক্ষিণে অবস্থিত 'ভরত রাজার বাড়ি' প্রত্নস্থল।

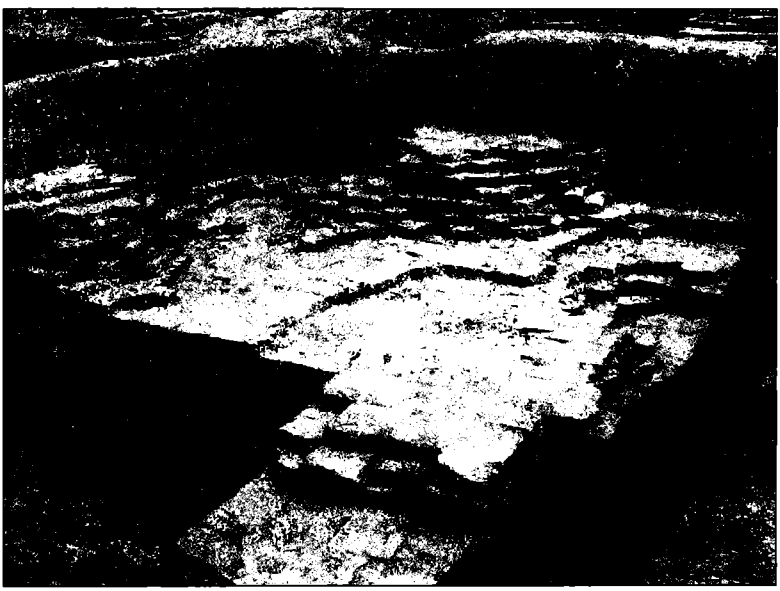

চিত্র-৫: উন্মোচিত কক্ষের মেঝে ও দেয়াল

প্রাচীন ও মধ্যযুগে গুরুত্বপূর্ণ বসতি ও স্থাপনার চারদিকে নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট পরিখা থাকাটা স্বাভাবিক ছিল। উল্লিখিত ভরত রাজার বাড়ি প্রত্নস্থল সমসাময়িককালের হলে তা গড়খাই ও নদীর বৃত্তের ভেতর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রত্নস্থলটি পরবর্তীকালের বলে তা ভিন্ন দূরত্বে গড়ে উঠে। ভরতভায়না ঢিবি থেকে পাওয়া সাংস্কৃতিক নিদর্শন গুপ্ত বা গুপ্ত-পূর্ব যুগের বলে চিহ্নিত হয়েছে। সেই তুলনায় অনেক বেশি নবীন ভরত রাজার বাড়ি প্রত্নস্থল থেকে পাওয়া প্রত্নবস্তু। ভরতভায়না নামকরণ সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে। বলা হয় সুন্দরবন এলাকায় 'ভরত' নামের এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। এই রাজাই ভরতভায়না ঢিবিতে মন্দির নির্মাণ করেন। সেই থেকে স্থানীয়ভাবে এই এলাকার নাম 'ভরতের দেউল' বা 'ভর্তের দেউল'। এখনও সুন্দরবন অঞ্চলে 'ভরত গড়' বলে একটি গড় আছে। এর কিছুটা দূরে আছে ইটের

www.pathagar.com

প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ। 'ভরত রাজার মন্দির' নামে এর পরিচিতি। কিংবদন্তির এই ভরত রাজা গুপ্ত বা গুপ্ত যুগের নন–অনেক পরের। এসব কারণে ধারণা করা যায় ভরতভায়না ঢিবি ঘিরে প্রথম বসতি যুগে হয়তো এ এলাকার নাম 'ভরতভায়না' ছিল না। পরবর্তীকালের স্মৃতিই মানুষের মনে বেশি সতেজ থাকে। পরবর্তীকালে গড়া ভরত রাজার বাড়ির ঐতিহাসিকতা যদি ঠিক থাকে তবে এই প্রাচীন ঢিবিটিকে সাধারণ মানুষ ভরত রাজার স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিল। অথচ উৎখননের পর নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে ক্রুশাকৃতির বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শন।

চিত্র-৬: পোড়ামাটির মুখমণ্ডল

উৎখননের পর ভরতভায়না ঢিবির ভেতর থেকে একটি মন্দির-পরিকল্পনার কাঠামো উন্মোচিত হয়েছে। এর তিনটি অংশ চিহ্নিত করা গিয়েছে। এগুলো হচ্ছে : ক. ক্রুশাকার বেষ্টনী, খ. বেষ্টনীর মাঝখান জুড়ে রয়েছে একটি মঞ্চ। ইটের তৈরি কয়েকটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠ রয়েছে এখানে। যেটুকু অংশ বর্তমানে টিকে আছে তার উচ্চতা ১১.৮৮ মিটার, গ. মূল মন্দির (অবশ্য বর্তমানে তা টিকে নেই)। প্রত্নস্থলে পাওয়া গিয়েছে পোড়ামাটির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফলক। তবে এর একটিও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায়নি। ছাঁচে তৈরি এবং হাতে গড়া দু'ধরনের ফলকেরই খণ্ডাংশ পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত মন্দিরের দেওয়াল অলংকরণ করার জন্য এসব ফলক ব্যবহার করা হতো। সম্ভবত এযাবৎকালে বাংলাদেশে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকের সর্ববৃহৎটি পাওয়া গিয়েছে এখানে। ঢিবি থেকে প্রায় ২০০ ফুট উত্তর-পূর্ব কোণে পুকুর পাড়ে মাটির তিন ফুট গভীরতায় এই ভাঙ্গা ফলকটি পাওয়া গিয়েছে। এখানে তিনটি নারী মূর্তির অস্তিত্ব স্পষ্ট। এদের মধ্যে প্রথমটি গলার নিচ থেকে পা পর্যন্ত অক্ষত রয়েছে, দ্বিতীয়টি অক্ষত রয়েছে হাঁটুর উপর থেকে পা

www.pathagar.com

পর্যন্ত এবং তৃতীয়টি পায়ের পাতার একটি খণ্ডাংশ। পোশাক-অলংকার প্রভৃতি থেকে অনুমান করা যায় এগুলো নর্তকীর প্রতিমূর্তি। প্রথম মূর্তিটির উর্ধ্বাঙ্গ নিরাভরণ, নিম্নাঙ্গে চেক ধুতি পরিহিত। গলায় দড়ির মতো পাকানো চেইন, হাতে কারুকার্যবিহীন চুড়ি, ফুলের ডিজাইন করা বাজুবন্দ, আর পায়ে রয়েছে মল। নর্তকীর হাতে রয়েছে একটি বাদ্যযন্ত্র। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় অন্য মূর্তিগুলোও একই ধরনের হতে পারে। বর্তমানে ফলকটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এই খণ্ডিত ফলকটির পরিমাপ বিবেচনায় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ফলকটির আকার অনুমান করেছেন ৫৬"X৩০"X৪"।

পোড়ামাটির আরো বিচিত্র প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়েছে ভরতভায়না ঢিবিতে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মানুষ ও গরুর মাথা, তেল প্রদীপ, মৃৎপাত্র, অলংকৃত ইটের টুকরা, পদচিহ্নযুক্ত ইট, পোড়ামাটির অলংকার ইত্যাদি। প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে বোঝা যায় সে যুগে নানা ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি হতো। যেমন–প্রদীপ, কলসি, বাটি, ছোট থালা, গোলাপদানি বা ফুলদানির উপরের অংশ, বড় পাত্রের ভাঙ্গা অংশ, খেলনা ইত্যাদি। পোড়ামাটি ছাড়াও এই প্রত্নস্থল থেকে পাওয়া গিয়েছে লোহার অস্ত্র ও দ্রব্যসামগ্রী, কড়ি এবং বেশ কিছু সংখ্যক পশুহাড়ের খণ্ড।

চিত্র-৭: মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা

উপরের আলোচনায় ভরতভায়না প্রত্নস্থলের পরিচিতি, বিস্তৃতি এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শন সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া গিয়েছে প্রত্নস্থলের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব চিহ্নিত করতে

www.pathagar.com

তা যথেষ্ট নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে একটি সাধারণ মন্তব্য যুক্ত করা যায়। বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য অনুসন্ধানে ভরতভায়না একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রাচীন বাংলাদেশের আবিস্কৃত প্রত্নস্থল হাতেগোণা। বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর আর ময়নামতি প্রত্নঅঞ্চলেই সীমিত হয়ে আছে এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। প্রাচীন বাংলার অত্যুজ্জ্বল মন্দির স্থাপত্যের কথা হিউয়েন সাঙের মতো পর্যটকদের বিবরণ থেকেই ধারণা করে নিতে হয়। উল্লিখিত প্রত্নস্থলসমূহ ছাড়া বাংলাদেশের বাকি অংশের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ইতিহাসে অস্পষ্ট। ঠিক এমন এক বাস্তবতায় নতুন সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ভরতভায়না প্রত্নঅঞ্চল।

এই গুরুত্ব নির্ধারণে প্রথম বিবেচনায় আনতে হয় প্রত্নস্থলের নির্মাণযুগের সময়কাল। পূর্বে বলা হয়েছে, ১৯২২ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের পক্ষ থেকে কে এন দীক্ষিত এ ঢিবিতে জরিপ করতে গিয়ে এখানে পাঁচ শতকের বৌদ্ধ মন্দির থাকার কথা বলেছিলেন। উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর অধিকাংশ গুপ্তযুগের বলে অনুমিত হচ্ছে। অবশ্য সময়কাল ও এর পরিধি নির্ধারণে আরো গবেষণার প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয় বিবেচনা হচ্ছে এ অঞ্চলে ধর্মীয় প্রয়োজনে একটি বিচ্ছিন্ন বসতি গড়ে উঠেছিল কিনা।

ভূতত্ত্ববিদগণের ধারণা প্লায়োস্টসিন যুগে যশোর অঞ্চলে ভূভাগের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এসময় গঙ্গা নদীর পলি জমে যে সকল দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চক্রদ্বীপ বা চাকদাহ, এড়োদ্বীপ বা এড়োদাহ, অক্রূদ্বীপ, বৃদ্ধদ্বীপ, সূর্যদ্বীপ ইত্যাদি।[২২] এক সময় দ্বীপগুলো এক বিশাল ভূখণ্ডের সৃষ্টি করে। বন-জঙ্গল কেটে ধীরে ধীরে এসব এলাকায় মানব বসতি গড়ে উঠতে থাকে। বর্তমান যশোর জেলা প্রাচীনকালে অসংখ্য নদনদী বিধৌত ছিল বলে এখানে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রথম বসতি গড়ে।[২৩] খ্রিষ্টীয় দুই শতকের টলেমির মানচিত্রে চিহ্নিত ব-দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলেই বর্তমান যশোর জেলা এবং গঙ্গার দুই প্রধান শাখা নদী ভাগীরথী ও পদ্মা নদী দ্বারা এ ব-দ্বীপ গড়ে উঠেছে।[২৪] এ অঞ্চলে শুধু মানব বসতি নয় মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় তাঁর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রবাহ যশোর-খুলনা অঞ্চলেও এসেছিল।[২৫] এভাবে অনুমান করা যায় ভরতভায়না অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণের একটি পটভূমি তৈরি হয়েছিল।

ভরতভায়না প্রত্নঅঞ্চল একটি বিচ্ছিন্ন অবস্থানে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়নি। বিস্তারিত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালিত হলে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে নিকট ও দূরবর্তী প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো নিয়ে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরম্পরা উন্মোচিত হওয়ার। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া যশোর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ইতোমধ্যে এই অঞ্চল প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখানে একটি বিশালাকার মাটির দুর্গ চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এর আশেপাশে চার-পাঁচ শতকের অর্থাৎ গুপ্তযুগের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। ছয় শতকের কয়েকজন রাজার পাঁচটি তাম্রফলক পাওয়া গিয়েছে এখানে। এসব ফলকের বর্ণনা থেকে জানা যায় সেকালে এই দুর্গের নাম ছিল 'চন্দ্রবর্মনকোট'। এই সূত্রে অঞ্চলটির প্রাচীনত্ব আরো পিছিয়ে নেওয়ার অবকাশ আছে। 'চন্দ্রবর্মনকোট' নামের সঙ্গে গুপ্ত-পূর্ব যুগে পুষ্কলাবতীর রাজা সিংহবর্মার পুত্র 'চন্দ্রবর্ম' অথবা গুপ্ত সম্রাট 'চন্দ্রগুপ্তের' নামের একটি ধ্বনিগত সম্পর্ক আছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে ছিল বৃহত্তর ফরিদপুর তথা গোপালগঞ্জের অবস্থান। এরই

www.pathagar.com

প্রতিবেশী এলাকা যশোর। তাই যৌক্তিক অনুমান করা যেতে পারে যে, ভরতভায়না অঞ্চল তিন শতকের দিকে পুষ্কলাবতীর রাজাদের অধীন এবং চার-পাঁচ শতকের দিকে গুপ্তদের অধীন ছিল। চন্দ্রবর্মনকোটে পাওয়া কোনো কোনো প্রত্নিদর্শনের সঙ্গে ভরতভায়নার প্রত্নিদর্শনের মিল রয়েছে। সুতরাং এই অনুমান করা খুব অসঙ্গত হবে না যে একই সাংস্কৃতিক বৃত্তে যুক্ত ছিল এই দুই অঞ্চল। আবার এই অনুমান করাও সঙ্গত যে এই বৃত্তের পরিধি আরো অনেক বিস্তৃত ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত প্রত্নস্থল 'চন্দ্রকেতুগড়ে'র অবস্থান ভরতভায়না থেকে আনুমানিক ৪০ কিলোমিটার দূরে। উৎখননে এখানে পাঁচটি সাংস্কৃতিক স্তর পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন স্তরের প্রত্নবস্তু পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে, এখানে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত মানব বসতি ছিল। চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া মৃৎপাত্রের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে ভরতভায়নার মৃৎপাত্রের।

এসব দৃষ্টান্ত অনুমান করতে সাহায্য করে ভরতভায়না প্রত্নস্থলের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনেক গভীরে প্রথিত। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নিদর্শন ইঙ্গিত দেয় যে, শধু বর্তমানে উন্মোচিত এবং চিহ্নিত প্রত্নস্থলেই নয় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও উৎখনন পরিচালনা করে একটি বিস্তৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উন্মোচনের সম্ভাবনা রয়েছে।

মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য : প্রত্নসূত্রে নতুন সংযোজন

তের শতকের শুরুতে বাংলার একাংশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনাকে বাংলার মধ্যযুগের যাত্রারম্ভ মনে করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে বাংলা জুড়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য আট শতক থেকেই বাংলায় মুসলিম আগমনের ধারা লক্ষ করা যায়। বণিক আরব ও সুফি-সাধকদের আগমনের মধ্যদিয়ে বাংলায় মুসলিম সমাজ বিকাশের যে পথ তৈরি হয়েছিল তার অনুষঙ্গী হয়েই মুসলমানদের সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছে এদেশে। মুসলিম আগমনের তিনটি ধারাতেই মুসলমানরা সফল হয়েছে। এই সাফল্য অর্জনে তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা যতটা না ভূমিকা রেখেছে তার চেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে মুসলিম আগমন-পূর্ব বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেক্ষাপট। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচারে মধ্যযুগ ছিল সোনাফলা। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থে এর বিস্তারিত উপস্থাপন নেই। এর প্রধান কারণই হচ্ছে সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থ না থাকা। ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি রূপরেখা পাওয়া গেলেও সমকালীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনেকটাই অনুপস্থিত। এ কারণে মধ্যযুগের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে প্রত্নসূত্র বিশ্লেষণের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে তার মধ্যদিয়ে তৈরি হয়েছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নতুন তথ্য সংযোজনের সম্ভাবনা।

বাংলায় মুসলিম শাসনকালের প্রথম অধ্যায়টি সাধারণত সুলতানি শাসনপর্ব নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই পর্বের সবচেয়ে গৌরবের সময় ছিল ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দুশো বছর। এ দীর্ঘ সময়ে দিল্লি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজ বিকাশ, উদার ধর্মনীতির প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক কাঠামো, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উজ্জ্বল পরিমণ্ডল রচনা, স্থিতিশীল প্রশাসনিক

www.pathagar.com

কাঠামোর বিন্যাস—সবকিছুর বিচারে স্বাধীন সুলতানি যুগ ছিল বাংলার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সময়। সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থ না থাকলেও সুলতানদের জারি করা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুদ্রা, সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ইমারতসমূহ, ইমারতের গায়ে সাঁটা শিলালিপি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ইতিহাস পুনর্গঠন করা অসম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যায়টি বিন্যাস করা ততটা সহজ নয়। তের শতকের শুরুতে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের সূচনা করেছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি। অতঃপর ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কালপরিসরে অনেকেই গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বাংলার প্রাথমিক মুসলিম শাসন তখন প্রধানত লখনৌতিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল। তবে শেষ দিকের কোনো কোনো শাসক রাজ্য বিস্তারে অনেকটা সফল হয়েছেন। লখনৌতি কেন্দ্রিক উত্তর বাংলাকে তাঁদের কেউ কেউ অতিক্রম করে পশ্চিম বাংলার 'সাতগাঁও কেন্দ্র' এবং পূর্ব বাংলার 'সোনারগাঁও কেন্দ্র'ও অধিকার করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী মুসলিম শাসন যুগে লখনৌতি নাম পরিগ্রহ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গৌড় নামেরই পরিপূরক এই লখনৌতি। এই পর্বের গভর্নরদের অনেকেই বিদ্রোহ করেছেন। দিল্লি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাজ্যপাট খুলে বসার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু দিল্লির বা দিল্লি অনুগত বাহিনীর আক্রমণে এই স্বাধীনতা দীর্ঘ দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে এ পর্যায়ের শাসকগণ নিজেদের স্বাধীন অবস্থান প্রচারের উদ্দেশে স্ব নামে মুদ্রা জারি করতেন। কোনো কোনো গভর্নরও প্রভুর নামে মুদ্রা জারি করেছেন। এ পর্বের শাসকদের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ শাসনকালে খুব অল্পই স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। তাই সীমিত সংখ্যক শিলালিপি পাওয়া যায় এ সময়। আবার সমকালীন ইতিহাসগ্রন্থ না থাকায় বাংলার মুসলিম শাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস পুনর্গঠনে মুদ্রা ও শিলালিপির মতো সূত্র অবলম্বনই একমাত্র ভরসা। এ ধারার প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র ব্যবহার ও বিশ্লেষণে ইতিহাসের সত্য নতুনভাবে উপস্থাপিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

বাংলায় মুসলিম শাসনকালের প্রথম অধ্যায়টি সাধারণত সুলতানি শাসনপর্ব নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই পর্বের সবচেয়ে গৌরবের সময় ছিল ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দুশো বছর। এ দীর্ঘ সময়ে দিল্লি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজ বিকাশ, উদার ধর্মনীতির প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক কাঠামো, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উজ্জ্বল পরিমণ্ডল রচনা, স্থিতিশীল প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাস–সবকিছুর বিচারে স্বাধীন সুলতানি যুগ ছিল বাংলার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সময়। সমকালীন ইতিহাসগ্রন্থ না থাকলেও সুলতানদের জারি করা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুদ্রা, সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ইমারতসমূহ, ইমারতের গায়ে সাঁটা শিলালিপি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ইতিহাস পুনর্গঠন করা অসম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যায়টি বিন্যাস করা ততটা সহজ নয়। তেরো শতকের শুরুতে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের সূচনা করেছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি। অতঃপর ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কাল পরিসরে অনেকেই গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বাংলার প্রাথমিক মুসলিম শাসন তখন প্রধানত লখনৌতিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল। তবে শেষ দিকের কোনো কোনো শাসক রাজ্য বিস্তারে অনেকটা সফল হয়েছেন। লখনৌতি কেন্দ্রিক উত্তর

www.pathagar.com

বাংলাকে তাঁদের কেউ কেউ অতিক্রম করে পশ্চিম বাংলার 'সাতগাঁও কেন্দ্র' এবং পূর্ব বাংলার 'সোনারগাঁও কেন্দ্র'ও অধিকার করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী মুসলিম শাসন যুগে লখনৌতি নাম পরিগ্রহ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গৌড় নামেরই পরিপূরক এই লখনৌতি। এই পর্বের গভর্নরদের অনেকেই বিদ্রোহ করেছেন। দিল্লি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাজ্যপাট খুলে বসার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু দিল্লির বা দিল্লি অনুগত বাহিনীর আক্রমণে এই স্বাধীনতা দীর্ঘ দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে এ পর্যায়ের শাসকগণ নিজেদের স্বাধীন অবস্থান প্রচারের উদ্দেশে স্ব নামে মুদ্রা জারি করতেন। কোনো কোনো গভর্নরও প্রভুর নামে মুদ্রা জারি করেছেন। এ পর্বের শাসকদের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ শাসনকালে খুব অল্পই স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। তাই সীমিত সংখ্যক শিলালিপি পাওয়া যায় এ সময়। আবার সমকালীন ইতিহাসগ্রন্থ না থাকায় বাংলার মুসলিম শাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস পুনর্গঠনে মুদ্রা ও শিলালিপির মতো সূত্র অবলম্বনই একমাত্র ভরসা।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৩৮ সালে। অব্যাহত থাকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত। এ পর্বে বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সমকালীন ইতিহাসগ্রন্থের অভাব এবং প্রত্ন নিদর্শনসমূহ অনুসন্ধান ও যথার্থ বিশ্লেষণের অভাবে সমকালীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তেমনভাবে উন্মোচিত হয়নি। সাম্প্রতিককালে সীমিতভাবে কিছু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে আর তার মধ্যদিয়ে যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক নতুন তথ্য।

দীর্ঘ দিনের বৌদ্ধ হিন্দু শাসিত বাংলার রাজ ক্ষমতা দখল করে মধ্যযুগের সূচনা করেন মুসলমান সুলতানগণ। এঁরা একদিকে বহির্বঙ্গীয় ও বহির্ভারতীয়, অন্যদিকে সম্পূর্ণ নতুন এক সংস্কৃতির ধারক। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নতুন এক ধর্ম—'ইসলাম'। তের শতকের শুরুতে মুসলমান শাসকদের ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়ার সূচনা হলেও ধর্ম হিসাবে আরো আগে থেকেই ইসলামের প্রভাব পড়তে থাকে বাংলায়। তবে সুলতানি শাসন নানা দিক থেকে এদেশের ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দৃষ্টিতে সুলতানি যুগের একটি আকর্ষণীয় দিক রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দাঁড়ায় এই নতুন ধর্ম-সংস্কৃতির ধারক সুলতানগণ এদেশের প্রধান ধর্মাচারী হিন্দু প্রজা সাধারণের প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রেখেছিলেন বা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল। সুলতানি বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উন্মোচনে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয়া জরুরি। আমাদের সহজলভ্য ইতিহাসগ্রন্থগুলো এ প্রসঙ্গে অনেকটাই নীরব। এর প্রধান বাস্তব কারণ হচ্ছে সমকালীন ইতিহাসগ্রন্থ না থাকা। ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র বিশ্লেষণ না করে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করার মানসে গৃহীত ইতিহাস চর্চায় বরাবরই বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছে। এই বিভ্রান্তির আরেকটি কারণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথ পরিহার করে ইতিহাসবেত্তাদের নিজস্ব ধারণার অবলম্বনে ইতিহাস চর্চা এবং নিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চার পথ অনুসরণ না করা। উদাহরণ হিসাবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাকে বিচার করা যেতে পারে। তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তে সমকালীন রাজশক্তির ধর্মীয় মনোভঙ্গি যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র বা শক্ত প্রামাণিক সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস উন্মোচনে সূত্র সংকট যখন প্রকট

www.pathagar.com

তখন ইতিহাসবিদের বিশ্লেষণে নিরপেক্ষতার বিষয়টি যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় তখন ব্যাহত হয় বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকারী মুসলমানদের ধর্মান্ধ গোঁড়া হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে 'মুসলমান শাসক হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী ও হিন্দু সংস্কৃতি ধ্বংসকারী ছিলেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন ছাড়া এ সময় হিন্দুগণ কোনোরূপ রাজানুকূল্য পায়নি। শ্রী মজুমদারের মতে 'হিন্দুর মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস চিরাচরিত প্রথা হয়ে উঠেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু দেশ বিজয়ী মুসলিম নেতা মুহম্মদ কাশিম থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ হিন্দু মন্দির ভাঙতে উৎসাহ দেখিয়েছেন।'[২৬] প্রসঙ্গটি আরো স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন যে, "হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ ও দরগাহ তৈরি ও হিন্দুকে পবিত্র ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা যে পুণ্যের কাজ এ শিক্ষাটা মুসলমানদের মজ্জাগত। সুতরাং বাংলার নবাগত তুর্কি মুসলমানরা এ বিষয়ে ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের তুলনায় পশ্চাৎপদ ছিল না।"[২৭]

সাধারণভাবে মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্কের কথা ইতিহাস ও সাহিত্যের সূত্রে জানা যায়। এদিক থেকে রমেশ চন্দ্র মজুমদারের উদ্ধৃত বক্তব্য বিপরীত ধারণার জন্ম দেয়। প্রকৃত সত্যে পৌঁছতে হলে সূত্র যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। দেখা যাচ্ছে মুসলমান কর্তৃক হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও বলপূর্বক হিন্দুকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার অভিযোগ আনতে গিয়ে লেখক তেমন জোরালো তথ্যসূত্র ব্যবহার করেননি যা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার জন্য অপরিহার্য ছিল। অথচ মনে হয়েছে তিনি তাঁর বোধ ও বিশ্বাস থেকেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মন্দির ভাঙ্গার তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে তিনি 'কোনো একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করেছিলেন।[২৮] কিন্তু সেই ঐতিহাসিক কে এবং সংশ্লিষ্ট সূত্র কি তা উল্লেখ করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি, যা ইতিহাস গবেষণার জন্য অপরিহার্য ছিল। এই 'ঐতিহাসিকে'র বিবরণ থেকে মজুমদার জানতে পেরেছেন 'বগুড়ার মহাস্থানে শিবের মন্দির, রাজশাহী (নওগাঁ) জেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার এবং চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের প্রাচীন স্তূপের ওপর নির্মিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ দরগাহ এখনও বর্তমান।[২৯] এছাড়াও রমেশ চন্দ্র মজুমদার ত্রিবেণীতে পাথরের তৈরি বিশাল হিন্দু মন্দির ছিল বলে উল্লেখ করেছেন যা ভেঙ্গে জাফর খানের সমাধি ও দরগাহ নির্মিত হয়েছে। এই দরগার অনেক প্রস্তর ফলকে হিন্দু সংস্কৃতির চিহ্ন লক্ষ করা যায়।[৩০] হিন্দুদের বলপূর্বক ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার যে দাবি রমেশ চন্দ্র মজুমদার করেছেন তার অনুকূলেও কোনো প্রমাণপত্রে তিনি উপস্থাপন করেননি। বরঞ্চ তাঁর বক্তব্যে যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যায় ধর্মান্তরিত হিন্দুর বৃহৎ অংশ ছিল সমাজের নিম্ন শ্রেণীর সদস্য। যারা নিজ ধর্মে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নিষ্পেষণের শিকার ছিল। ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে এ সমস্ত অধিকার ফিরে পাওয়ার সুযোগ ছিল বলেই এরা ধর্মান্তরিত হয়েছিল।[৩১] অর্থাৎ তাঁর এই বক্তব্যেই বল প্রয়োগের অভিযোগ উপেক্ষিত হয়েছে। মুসলমানদের অস্ত্র প্রয়োগের উদাহরণ হিসাবে সুফি শাহজালাল মুজররদ কর্তৃক সিলেট অঞ্চলে হিন্দু রাজাকে পরাজিত করে ইসলাম বিস্তারের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[৩২] এ জাতীয় উদাহরণ রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংঘাতকেই স্পষ্ট করে। জোরপূর্বক সাধারণ হিন্দুকে ব্যাপকভাবে মুসলমান করার কথা উচ্চারিত হওয়ার মতো প্রামাণিক সূত্র পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রমেশ চন্দ্র মজুমদার মুসলিম শক্তির আচরণ ও মনোভঙ্গিতে যে পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং আগ্রাসী তৎপরতার অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন তার পক্ষে কোনো সবল ঐতিহাসিক সূত্র তিনি উপস্থাপন করতে পারেননি; বরঞ্চ তাঁর সিদ্ধান্ত দুর্বল এবং কখনো স্ববিরোধী হয়ে পড়েছে। তাই মুসলমান শক্তি কর্তৃক মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়ার অভিযোগ সম্পর্কে ইতিহাসের ভাষ্য কি তা প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে পরীক্ষা করার অবকাশ রয়েছে।

প্রথমে ইতিহাসের সূত্র থেকে দেখা যেতে পারে মুসলিম শক্তির মানসভূমিতে পরধর্ম সম্পর্কে কতটা বৈরি মনোভাব ছিল, যা মন্দির ভাঙ্গাকে উৎসাহিত করেছে। এ ক্ষেত্রে বখতিয়ার খলজি প্রসঙ্গে বদায়ুনির মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন যে, বিজয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে বখতিয়ার হিন্দু মন্দিরসমূহ উপড়ে ফেলেছেন এবং মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দিয়ে তৈরি করেছেন মুসলমানের মসজিদ।[৩৩] মধ্যযুগের শিলালিপি অধ্যয়ন করলে হিন্দু মন্দির বা মূর্তি ভাঙ্গার পক্ষে কিছুটা যুক্তি পাওয়া যায়। লিপি পাঠে না হলেও শিলালিপি-সংশ্লিষ্ট স্থাপনা পর্যবেক্ষণ করলে এ ধরনের ধারণা তৈরি হতে পারে। যেমন হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত জাফর খাঁ গাজীর সমাধি সংলগ্ন মসজিদে ৬৯৮ হিজরি অর্থাৎ ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিটির কথা বলা যেতে পারে। একটি মাদ্রাসা নির্মাণের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে।[৩৪] এই মসজিদটি তৈরি করা হয়েছিল কোনো মন্দিরের ইট-পাথর দিয়ে। মসজিদে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি পাথরে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির ভগ্নাংশ দেখা যায়। মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত সাদিপুর গ্রামে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন দরগায় জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। মূর্তির পাথরে উৎকীর্ণ করা হয়েছে আরবি লিপি। মসজিদের গায়ে সাঁটা শিলালিপিতে যেমন হাদিস উৎকীর্ণ করা হয় এখানেও তেমন হাদিস উৎকীর্ণ ছিল। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী পাথরটি শতাধিক বছর পূর্বে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে আনা হয়েছিল।[৩৫]

সুলতান জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহের (১৪১৫-১৪৩৩ খ্রি.) সময় উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি পাওয়া যায় ঢাকার মান্দ্রা অঞ্চলে। এটি ক্ষোদিত হয়েছে একটি ব্যাসল্ট শিলায়। শিলাটির উল্টো পিঠে ছিল একটি ভগ্নদশা হিন্দু দেব মূর্তি। হয়তো কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনার পাথরখণ্ডে লিপি উৎকীর্ণ করে তা মসজিদে সংস্থাপন করা হয়েছিল।[৩৬] চব্বিশ পরগণা জেলার বশির হাটে অবস্থিত 'সালিক' মসজিদও ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের মাল-মসলা দিয়ে তৈরি হয়েছিল বলে ধারণা করা করা হয়।[৩৭] সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময় (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) ৯১২ হিজরি অর্থাৎ ১৫০৭ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের মাহিসন্তোষে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের গায়ে সংস্থাপিত একটি কালো ব্যসল্ট পাথরের এক পিঠে মসজিদ নির্মাণের স্মারকলিপি উৎকীর্ণ ছিল; অপর পিঠটি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় এটি ছিল একটি বিষ্ণু মূর্তির স্তম্ভ এবং তার চারপাশে পদ্ম ও অন্যান্য প্রতীকে অলংকৃত ছিল।[৩৮]

এখন বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে উপরের উদ্ধৃতিগুলো সামনে রেখে মুসলিম শক্তির বৈরী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অভিযোগ কতটা গ্রহণযোগ্য। উপরে উদ্ধৃত উদাহরণসমূহের প্রায় সবগুলোতেই যে সমস্ত হিন্দু উপকরণ, বিশেষ করে দেবমূর্তি সংবলিত শিলাখণ্ড রয়েছে তা হুবহু মসজিদে ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো

www.pathagar.com

কোনো শিলালিপিতে একপিঠে আরবি, ফারসি হরফে ইসলামের ধর্মীয় বাণী উৎকীর্ণ রয়েছে এবং তার উল্টো পিঠে দেবমূর্তি বা প্রতীক সংযুক্ত হয়েছে। ইসলামধর্মে প্রাণিচিত্র অঙ্কন বা মূর্তি খোদাইয়ে যথার্থ অনুমোদন নেই।[৩৯] হিন্দু মন্দির এবং মূর্তি ভাঙ্গার অভিযোগ যে মুসলিম শক্তির ওপর ধরে নেওয়া যায় তারা নিজ ধর্মের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল এবং এই 'গোঁড়া' মুসলমানদের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েই তৃপ্ত থাকার কথা। অবৈধ বা অস্পৃশ্য প্রতীক বা মূর্তি সংবলিত প্রস্তরখণ্ড এনে খোদ মসজিদে প্রতিস্থাপন করে তাদের দৃষ্টিতে চরম অধর্ম করা কোনো যুক্তিতেই সম্ভব নয়। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে তা-ই দেখা গিয়েছে। সুতরাং নতুনভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগ এখানে রয়েছে।

ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা তথা ভারতে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাসীন মুসলমান কর্তৃক মন্দির ধ্বংস, মন্দিরের পাথর নদী বা পুকুরে নিক্ষেপ অথবা মূর্তি পূজার প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তবে সেখানে ধর্মীয় উদ্দেশ্যের চেয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই বেশি ছিল। শুধু মুসলমান নয়, প্রাচীনকাল থেকে ভারতের অমুসলিম রাজন্যবর্গের আচরণে একই ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে।[৪০] অপরপক্ষে বাংলার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন থেকে হিন্দু আধিপত্য একেবারে হারিয়ে যায়নি। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হচ্ছে মুসলিম অধিকারের পাঁচ শতাধিক বৎসর পর ইংরেজরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করে দেখতে পায় বাংলার জমিদারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তখনও হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।[৪১]

মুসলমান সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি আবশ্যিক কর্ম ছিল মসজিদ নির্মাণ। নির্মাণ-উপকরণ হিসাবে বাংলায় পাথরের উৎস নেই। হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাংশ এবং মূর্তির পাথর ধর্মীয় দৃষ্টিতে না দেখে স্বাভাবিক স্থাপত্যিক প্রয়োজনেই মুসলমানগণ তা মসজিদ নির্মাণে ব্যবহার করেছেন। মুসলমান শাসক ও সুফিদের দ্বারা সচেতনভাবে মন্দির ভাঙ্গার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। অনুমানের উপর নির্ভর করেই এ জাতীয় কথা বলা যায়। এই সঙ্গে আরো সক্রিয়, যৌক্তিক ও ইতিহাস ঘনিষ্ঠ অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত মুসলিম শক্তি প্রবেশের সময় যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে কিছু সংখ্যক মন্দির ধ্বংস হতে পারে, দ্বিতীয়ত মুসলিম অধিকারের পর অঞ্চল বিশেষে পরাজিত হিন্দু জনগোষ্ঠী পালিয়ে গেলে তাদের মন্দিরসমূহ পরিত্যক্ত হয়ে পড়তে পারে, তৃতীয়ত ধর্মোন্মত্ততার কারণে অথবা ধনাগার প্রাপ্তির আশায় অথবা আত্মগোপনকারী বিদ্রোহী হিন্দুদের বন্দি করার জন্য কোথাও শক্তিধর মুসলমান কর্তৃক হিন্দু মন্দির ধ্বংস হতে পারে। এই বিবিধ অবস্থা থেকেই মন্দিরের ভগ্নাংশ ও মূর্তি সংবলিত পাথর মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে এবং তা তারা মসজিদে ব্যবহার করেছে। এখন বিচার্য বিষয় হচ্ছে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানগণ মসজিদে এ জাতীয় উপকরণ ব্যবহার করেছেন। এর পক্ষে সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ যে যুক্তি হতে পারে তা হচ্ছে সাংস্কৃতিক চেতনার দিক থেকে এ সময়ের মুসলমান শাসকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ধর্মীয় ছুৎমার্গের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁরা রক্ষণশীলতার বদলে প্রয়োজন ও সৌন্দর্যবোধকে বড় করে দেখেছেন।[৪২]

পূর্বে উল্লিখিত জাফর খাঁর মসজিদ এবং ছোট পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত বারোদুয়ারি মসজিদটির দিকে দৃষ্টি দিলে এই মন্তব্যের সারবত্তা আরো স্পষ্ট হবে। শেষোক্ত

www.pathagar.com

মসজিদটির কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয় এটিও জাফর খাঁর সময়কালে তৈরি করা হয়েছিল। স্থাপত্যিক রীতির দিক থেকে মনমোহন চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৪৩] মসজিদ দুটোর সাধারণ পরিকল্পনা ইসলামি স্থাপত্যিক রীতির অনুসঙ্গী ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ বিন্যাস ঘটেছে এদেশের হিন্দু রীতির অনুকরণে। ভেতরের দেওয়াল, স্তম্ভ এবং মিহরাবের উপরের অলংকরণ হিন্দু ঐতিহ্যেরই ধারক। খিলান এবং গম্বুজের আকৃতিতেও হিন্দু রীতির প্রভাব স্পষ্ট। ধারণা করা হয় তুর্কি বিজেতাগণ স্থানীয় হিন্দু স্থপতিদের ওপরই মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এঁরা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরসমূহের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি মসজিদ নির্মাণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এ থেকে ধারণা করা সহজ যে, এ সময়ের মুসলমান শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মীয় সংকীর্ণতা জায়গা করে নিতে পারেনি। মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়ার মধ্যে যে একটি পরধর্ম বিদ্বেষী হিংসা জড়িয়ে থাকে উপরের দৃষ্টান্ত থেকে সকল ক্ষেত্রে তেমন দোষে সংশ্লিষ্ট মুসলমান শক্তিকে অভিযুক্ত করার উপায় নেই। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না বলে তাঁরা অবলীলায় দেবমূর্তি সংবলিত পাথর এবং হিন্দু রীতির অলংকরণ তাঁদের বিচারে মসজিদের মতো পবিত্র ধর্মীয় স্থানে প্রতিস্থাপন করতে পেরেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে আরো বলিষ্ঠ উদাহরণ রয়েছে। মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান মুসলিম শাসন কেন্দ্র সোনারগাঁওয়ের মোগড়াপাড়ায় গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধির অনতিদূরে সুলতানি যুগের কয়েকটি স্থাপত্যিক নিদর্শন রয়েছে। একপাশে কয়েকটি মাজার, তার পাশে একটি মসজিদ এবং মসজিদের সামনে রয়েছে সমাধিক্ষেত্র। এই সমাধিক্ষেত্রে চৌদ্দ শতকের প্রখ্যাত সুফি হযরত শরফুদ্দিন আবু তওয়ামার সমাধি বলে প্রচারিত একটি নিরাভরণ কবর রয়েছে। সমাধিক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারক দেওয়ালের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে একটি শিলালিপি। পাথরটির উল্টো পিঠে বাসুদেবের মূর্তি খোদিত। তাছাড়া মসজিদটির সামনে ও পেছনে ইতঃস্তত ছড়িয়ে রয়েছে শিবলিঙ্গের খণ্ডিত অংশ ও খিলানের পাথর। যদি ধর্মীয় সংকীর্ণতা সমকালীন মুসলমানদের মধ্যে উপস্থিত থাকত তাহলে মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের পাশ থেকে অন্য ধর্মের নিদর্শন অপসারিত হওয়ার কথা। অথচ বহু শতক পার হওয়ার পর এক দশক আগেও বর্তমান প্রবন্ধের লেখক এগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদের কথা বলা যেতে পারে। শিলালিপি সাক্ষ্যে জানা যায় ৭৭০ হিজরি অর্থাৎ ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দর শাহের রাজত্বকালে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। আদিনা মসজিদের বাইরের ও ভেতরের দেওয়ালে অনেক দেবদেবী ও জীবজন্তুর অবিকৃত মূর্তি রয়েছে। মসজিদের দরজার সঙ্গে একই মাপের প্যানেলে রয়েছে হিন্দু দেবতার মূর্তি।[৪৪] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান প্রবন্ধের লেখক ১৯৯৪ সালে বাস্তব পর্যবেক্ষণে এসব হিন্দু নিদর্শনের অনেকটাই অক্ষুণ্ন থাকতে দেখেছেন। রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এইচ. এস. স্টাপলটনের মতে, গণেশ ক্ষমতায় এসে আদিনা মসজিদকে তাঁর কাছারি বাড়িতে রূপান্তর করেছিলেন।[৪৫] ধারণা করা হয় এই সময় গণেশ দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করেন।[৪৬] এই যুক্তি মেনে নেওয়ার পরও বলা যায়, গণেশ পরবর্তী দীর্ঘকাল পরিসর জুড়ে বাংলার শাসন ক্ষমতায় মুসলমানগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহলে ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান সুলতানদের কেউ এ সমস্ত মূর্তি

www.pathagar.com

অপসারণ বা নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস পেলেন না কেন? এর একটিই উত্তর হতে পারে যে, তাঁরা ধর্মীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন এবং মানসিকভাবে তাঁরা সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাই নান্দনিকতার প্রকাশ বিবেচনা করে হয়ত তাঁরা মসজিদ থেকে দেবমূর্তির শিল্প অপসারণ করেননি। শুধু মূর্তিই নয়, মিহরাবের উপরে পশ্চিম দেওয়াল জুড়ে পাথর এবং পোড়া মাটির অলংকরণও লক্ষণীয়। এখানে অঙ্কিত জ্যামিতিক ও লতাপাতার নকশায় ইসলামি ও হিন্দু উভয় রীতির উপস্থিতি ছিল।[৪৭]

বর্তমান চাঁপাই নবাবগঞ্জে অবস্থিত ছোটসোনা মসজিদের দেওয়ালের পাথরেও অনেক দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত ছিল। পাথরের মূর্তির দিক আড়াল করে উল্টো পিঠ বাইরের দিকে রাখা হয়েছিল। এখানে খোদাই করা হয়েছিল নানা নকশা। এ প্রসঙ্গে মানরিকের বিবৃতি উদ্ধৃত করে স্টাপলটন বলেন যে, মানরিক ১৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ে একটি পাথরের জলাধারে দেবমূর্তি দেখেছিলেন, যার চারপাশে ছিল লতাপাতা ও খোদাইয়ের কাজ। এ থেকে ধারণা করা যায় সে যুগে গৌড়ের মুসলমান শাসকগণ অধিকারভুক্ত অঞ্চলে হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তির অবস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন।[৪৮] এসব কারণে সমসাময়িককালে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুলতানদের বৈরী দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় না। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাধারণ মুসলমানের মানসিকতায় বাস্তব কারণেই উদার মনোভাবের পরিচয় মেলে। ধর্মান্তরিত হলেও তাঁরা পূর্বতন হিন্দু ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করতে পারেননি। তেমন কোনো রক্ষণশীল বিধি তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে ইতিহাসে সাক্ষ্য নেই। পীর এবং তাঁদের সমাধি পূজা যে কারণে সামাজিক ধর্মীয় আচারে পরিণত তা প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। এ সময়ের মুসলমানগণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামিকরণ করেননি। এ কারণেই হিন্দু দর্শন ও মুসলিম ধর্মীয় চিন্তার মিশ্রণে ক্রমে বাংলায় লৌকিক ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছিল।[৪৯] এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই সাংস্কৃতিক ও মানসিক দিক থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধারা বজায় রেখেছিল।

হিন্দু প্রজাসাধারণের প্রতি মুসলমান সুলতানদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা আরো স্পষ্ট করার জন্য সমকালীন মুদ্রা বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে। বাংলার সুলতানদের বেশ কিছু সংখ্যক আকর্ষণীয় মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এসব মুদ্রার এক পিঠে প্রচলিত মুসলিম রীতি অনুযায়ী সুলতানের নাম, তারিখ, টাকশাল, সমকালীন বাগদাদের বা মিশরের ফাতমি খলিফাদের নাম এবং কালিমা খোদিত থাকছে। আবার অন্য পিঠে থাকছে অশ্বারোহীর মূর্তি অথবা হিন্দু দেবদেবীর প্রতীকী ছবি। অর্থাৎ মুসলিম ধারার সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির মিশ্রণ। বিষয়টি গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সুলতানি বাংলার মুদ্রার বৈশিষ্ট্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা গেলেও প্রধানত তা ভারতবর্ষে জারিকৃত মুদ্রার আঙ্গিক ধারণ করেই এগিয়েছে। প্রাদেশিক আরব শাসকগণ কর্তৃক সিন্ধু অঞ্চলে জারিকৃত রৌপ্য মুদ্রা এই ক্ষেত্রের সূচক বলা যেতে পারে। খিষ্টীয় সাত ও আট শতকের এ সমস্ত মুদ্রা উমাইয়া মুদ্রা রীতিতেই উৎকীর্ণ হয়েছিল।[৫০] তবে ভারতে মুসলিম মুদ্রার সুনির্দিষ্ট ধারা এগার শতকের পূর্বে দৃশ্যমান হয়নি। এই শতকের শুরুতেই সুলতান মাহমুদ কর্তৃক পরিচালিত অভিযানগুলোর মাধ্যমে ভারতে মুসলমানদের স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। ১০৫১ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদের বংশধরদের দ্বারা লাহোরে রাজধানী স্থাপন ও টাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

www.pathagar.com

একটি সুনির্দিষ্ট মুদ্রা ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ সময়ের মুদ্রার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুটো ভিন্ন রীতির অবস্থান। সম্পূর্ণ আরবি লিপিতে উৎকীর্ণ মুদ্রা গজনি অঞ্চলে চালু ছিল আর উত্তর ভারতে প্রচলিত মুদ্রার লিপি উৎকীর্ণ হতো আরবি ও সংস্কৃতের সমন্বয়ে।[৫১] সুলতানি যুগে দিল্লির সুলতান এবং প্রাদেশিক মুসলিম শাসনকর্তাগণ তাঁদের শাসন কর্তৃত্ব এবং স্বাধীন শাসনের মর্যাদা প্রকাশের জন্য স্বনামে মুদ্রা অঙ্কন ও খুতবা পাঠ করতেন। কখনো কখনো এর কিছু ব্যতিক্রমও ঘটত। তবে ভারতে মুসলমান শাসকগণ মুদ্রা অঙ্কনের ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। মুসলিম ধর্মাদর্শ প্রতিমূর্তি বা প্রাণীদেহের ছবি অঙ্কন সমর্থন করে না (এ সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে)। তাই মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই ভারতের মুসলিম সুলতানদের মুদ্রার উভয় পিঠেই প্রধানত আরবি লিপি উৎকীর্ণ করা হতো। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হলেও এর কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে। এই ব্যতিক্রমী মুদ্রা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মধ্যদিয়েই অমুসলিম প্রজার প্রতি সুলতানদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ ঘোরির (১১৭৩-১২০৬ খ্রি.) সামরিক সাফল্যের পথ ধরে ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মুদ্রা অঙ্কনের ক্ষেত্রে এ যুগের মুসলিম শাসনকর্তাদের মধ্যে তেমন কোনো রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়নি বরং যা প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই বহিঃপ্রকাশ। মোহাম্মদ ঘোরি স্থানীয় প্রচলিত মুদ্রাগুলোর মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন আনেননি। এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একদিকে যেমন সমঝোতা গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে নতুন রৌপ্য মুদ্রা প্রবর্তন করার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণের দায় থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য তিনি তাম্র এবং 'বিলুন' নামে পরিচিত রূপা এবং তামার মিশ্রণে তৈরি এক প্রকার মুদ্রা চালু করেন। এ সমস্ত মুদ্রা বিন্যাসে পর্যাপ্ত হিন্দু রীতির স্বাক্ষর লক্ষ করা যায়।[৫২] তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মুদ্রায় হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসছিল। স্বাভাবিক কারণেই প্রথম দিকের মুসলিম মুদ্রায় ভাষা ও লিপির ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট ছিল। মাহমুদপুর টাকশাল থেকে ৪১৮-১৯ হিজরিতে (১০২৮ খ্রি.) জারি করা সুলতান মাহমুদের মিশ্র ভাষার মুদ্রায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতান মাহমুদ লাহোরের নাম পরিবর্তন করে মাহমুদপুর রেখেছিলেন। মুদ্রার সোজা পিঠে 'কুফিক' নামের এক প্রকার প্রাচীন আরবি হরফে কালিমা, তারিখ এবং টাকশালের নাম উৎকীর্ণ ছিল। এর আকৃতি, নকশা এবং ওজন গজনির সুলতানদের নিজস্ব রীতিরই পরিচয় বহন করে। কিন্তু মুদ্রার বিপরীত পিঠে দেবনাগরি লিপিতে কলিমার অনুবাদ রয়েছে। অনুবাদে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকায় হিন্দু দর্শন ও মুসলিম দর্শনের মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত সম্মিলনের ভাব প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়।[৫৩] লাহোরে মাহমুদের বংশধরেরা এগার শতকের মাঝপর্বে ছোট ছোট স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন। এগুলোর মধ্যে হিন্দু প্রতীকের ব্যবহার স্পষ্ট। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মুদ্রার সামনের পিঠে একটি ষাঁড়ের ছবি এবং 'সামন্তদেব' কথাটি উৎকীর্ণ থাকত। সামন্তদেব কথাটি লেখা থাকত নাগরি লিপিতে। বিপরীত পিঠে কুফিক হরফে সুলতানের নাম লেখা হতো। ভারতীয় রীতির অনুকরণে খোদিত মোহাম্মদ ঘোরির মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। এই মুদ্রার সামনের দিকে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি ও নাগরি লিপিতে সুলতানের নাম 'মোহাম্মদ বিন সাম' উৎকীর্ণ ছিল।[৫৪]

www.pathagar.com

একই ধারার প্রতিফলন ঘটে বাংলার সুলতানদের মুদ্রায়। নদীয়া বিজেতা বখতিয়ার খলজি তাঁর বিজয়ের স্মারক হিসাবে বিশেষ মুদ্রা জারি করেছিলেন। নিজ নামের বদলে মুদ্রায় ব্যবহার করেছিলেন প্রভু মোহাম্মদ বিন সাম অর্থাৎ মোহাম্মদ ঘোরির নাম। মুদ্রার সামনের পিঠে বর্শা বা গদাধারী একজন অশ্বারোহীর ছবি খোদিত রয়েছে। নিচের দিকে নাগরি লিপিতে লেখা রয়েছে 'গৌড়বিজয়'। অপর পিঠে আরবি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিতে সুলতান মোহাম্মদ বিন সামের নাম উৎকীর্ণ ছিল। অনুরূপ অশ্বারোহী প্রতীক খোদিত ২০ রতি ওজনের স্বর্ণমুদ্রা জারি করেছিলেন কুতুব উদ্দিন আইবক ও শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশের প্রেরিত গৌড়ের শাসনকর্তা আলী মর্দান খলজি।[৫৫] জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ্ (১৪১৫-১৪৩২ খ্রি.) ও নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৩৩-১৪৫৯ খ্রি.) মুদ্রায় সমান্তরাল রেখায় অদ্ভুত নকশায় সিংহের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে।[৫৬] জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহের (১৪৮১-১৪৮৬ খ্রি.) একটি আকর্ষণীয় রৌপ্য মুদ্রায় সাত-রশ্মি সংযুক্ত সূর্যদেবের প্রতীক রয়েছে।[৫৭]

বাংলার সুলতানদের মুদ্রায় এ জাতীয় হিন্দু প্রতীকের ব্যবহার থেকে সাধারণভাবে যে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সুলতানগণ এদেশের হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারই প্রতিফলন ঘটেছিল এসব মুদ্রায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কতগুলো জরুরি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। প্রথমত মুসলিম শক্তির এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পর থেকেই কি এই সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের মিশ্রণ লক্ষ করা গিয়েছে? দ্বিতীয়ত এই মিশ্রণ তাঁদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে প্রকাশ করে? তৃতীয়ত এই মিশ্রণের পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, মুসলমানদের এদেশে প্রবেশের অনেক আগেই মুসলিম মুদ্রায় ধর্মীয় আদর্শ উপেক্ষা করে প্রাণিচিত্র খোদিত হয়েছে। আব্বাসীয় খলিফা আল মুক্তাদির বিল্লাহ জাফরের (৯২৭-৯৫২ খ্রি.) একটি মুদ্রায় ষাঁড় ও অশ্বরোহীর প্রতীক পাওয়া যায়।[৫৮] মুদ্রাটির সামনের পিঠে ছিল ঘোড়ার উপর আসীন খলিফা এবং অপর পিঠে ভারতীয় কুঁজওয়ালা ষাঁড়ের প্রতিকৃতি। এ থেকে ধারণা করা চলে যে, খোদ আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যেই কোনো ধর্মীয় রক্ষণশীলতা কাজ করেনি। কারো মতে হয়তো বাইজেন্টাইন মুদ্রা রীতি দ্বারা এ ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খলিফাগণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ হেরাক্লিয়াসের গ্রিক ও ল্যাটিন ধরনের মুদ্রায় সম্রাটের প্রতিকৃতির পাশে সন্তানদের প্রতিকৃতিও স্থান পেত।[৫৯] প্রাচীন গ্রিক মুদ্রায় এ জাতীয় প্রতিকৃতি থাকলেও মনে করা হয় ভারতীয় সংস্কৃতিই প্রভাবিত করেছিল আব্বাসীয় খলিফাকে। কাবুল অধিপতি সামন্তদেব ৮৭০ থেকে ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাগদাদের খলিফা মুক্তাদির বিল্লাহর প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে কাবুল শাসন করেছিলেন। সামন্তদেবই প্রথম ভারতবর্ষে ষাঁড় ও অশ্বারোহী প্রতীক সংবলিত মুদ্রা জারি করেন।[৬০] ইরাকের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে কাবুলে প্রবেশ করা খুবই সহজ। সুতরাং বাণিজ্য বা বিজয় অভিযানের পথ ধরে সামন্তদেবের অশ্বারোহী ও ষাঁড় প্রতীকের মুদ্রা স্বাভাবিকভাবেই বাগদাদে পৌঁছতে পারে।

আরবদের হাতে কাবুলের পতন ঘটেছিল ৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে। সুতরাং মুসলমানদের বাংলা অধিকারের পূর্বেই আরবগণ যে কোনো ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত এই জাতীয় মুদ্রা। তাই বাংলার মুসলমান শাসকগণ শুরু

www.pathagar.com

থেকে ঐতিহ্যের অনুসরণেই সাংস্কৃতিক উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁদের মুদ্রায় অশ্বারোহীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। সিংহ এবং সূর্যের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণের মধ্যদিয়ে সংশ্লিষ্ট সুলতানদের হিন্দু সংস্কৃতি আত্মস্থ করার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে।

উপরের বিশ্লেষণেই দ্বিতীয় প্রশ্নের কিছুটা সমাধান রয়েছে। আরো স্পষ্ট করে এভাবে বলা যায়, মুসলমান সুলতানগণ তাঁদের ধর্মীয় চেতনা বিস্মৃত না হয়েও রক্ষণশীলতা বর্জন করে উদার মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। তাই একদিকে যেমন মুদ্রায় কলিমা উৎকীর্ণ হচ্ছে–লিপিভাষ্যে খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হচ্ছে, নিজেদের উপস্থাপন করা হচ্ছে 'ইসলাম ও মুসলমানের সহায়তাকারী' হিসাবে; আবার অন্যদিকে ইসলামি সংস্কৃতি বিরোধী হিন্দু প্রতীকের চিহ্ন উৎকীর্ণ করা হচ্ছে অবলীলায়। সূর্যকে দেবতা জ্ঞান করে পূজা করা ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন আচার। শুধু মুদ্রায় নয়—সূর্যের প্রতিকৃতি জালালউদ্দিন ফতেহ শাহের নাম সংবলিত শিলালিপিতেও দেখা যায়। ফতেহ শাহ সেই সুলতান যাঁর সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তত আটটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[৬১] শুধু তাই নয়, শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, বাবা সালেহ ও মাওলানা আ'তা ওয়াহিদ উদ্দিন নামে দুজন মুসলিম সুফিও সুলতানের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ ইসলামি সংস্কৃতি প্রতিপালন করার দায়িত্ব সুলতানগণ গ্রহণ করেছিলেন। তাই বলা যায় মুদ্রা ও শিলালিপিতে সূর্যদেবের প্রতীক ব্যবহার করে একই সুলতান ইসলামি সংস্কৃতির পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করার উদারতা দেখাতে পেরেছিলেন। এভাবেই এদেশে একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তোলার মানসিকতা স্পষ্ট হতে থাকে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রমাণসহ উপস্থাপন করা কষ্টসাধ্য। রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে বিজেতা শক্তিকে অনেক সময় স্থানীয় সংস্কৃতি গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষণ করতে দেখা যায়। এর পক্ষে উদাহরণ সুখময় মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তাঁর মতে আলাউদ্দিন হুসেনশাহ রাজনীতি-চতুর ছিলেন বলে হিন্দু ধর্মের প্রতি তেমন বিদ্বেষ ভাব দেখাননি।[৬২] কিন্তু মুদ্রায় প্রাণিচিত্র অঙ্কন অথবা সূর্যের প্রতিকৃতি স্থাপনের মাধ্যমে নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগী সুলতানদের রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের আনুকূল্য কতটা থাকতে পারে? রাজনৈতিক প্রয়োজন সামনে রেখে ইলিয়াস শাহী সুলতানদের সময় থেকে অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করা হয়েছে। হিন্দু পণ্ডিত ও কবিগণ রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এ জাতীয় আনুকূল্য প্রদান করেও নিজ ধর্মের প্রতিপালক হিসাবে রাজ্য পরিচালনা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু প্রাণিচিত্র অঙ্কন যেখানে ইসলাম সরাসরি অনুমোদন করেনি সেখানে কলিমা সংযোজিত মুদ্রায় প্রাণিচিত্র উৎকীর্ণ করানো বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে। নির্দিষ্ট কয়েকজন সুলতানের পক্ষে এ জাতীয় ভূমিকা গ্রহণ করে রাজনৈতিক সুযোগ লাভের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে সমকালীন ইতিহাসে কোনো সাক্ষ্য নেই। সুতরাং এ জাতীয় দৃষ্টান্ত কট্টর ধর্মনীতির বদলে উদার সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন হিসাবেই সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা যেতে পারে। সুলতানি শাসনের ধারাবাহিকতায় সাময়িক বিরতি এবং এবং মুদ্রায় হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিফলন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা যায়। ইলিয়াসশাহী বংশের তৃতীয় শাসক সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের (১৩৮৯-

www.pathagar.com

১৪১০ খ্রি.) পরই প্রকৃতঅর্থে বাংলার শাসন ক্ষমতায় হিন্দু শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। এর নেতৃত্বদানকারী প্রভাবশালী অমাত্য দনুজমর্দ্দনদেব (৮২০-৮২১ হিজরি) ও তাঁর ছেলে মহেন্দ্রদেব নামাঙ্কিত রাজাদ্বয় যথাক্রমে গণেশ ও তাঁর পুত্র যদুর (জালালউদ্দিন) ছোট ভাই বলে শনাক্ত করা হয়েছে।[৬৩] মুদ্রাগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে বাংলা অক্ষরে লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। রাজার নামের পূর্বে 'শ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণ'–এই বিশেষণটি যুক্ত রয়েছে। চণ্ডীর নামোল্লেখ থেকে অনুমিত হয় যে, আলোচ্য দুই শাসকের কূলদেবতা ছিলেন চণ্ডী দেবী। এই সিদ্ধান্ত থেকে যে সত্যটি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে এ যুগের সমাজে তান্ত্রিক আচার উপস্থিত ছিল। আমরা জানি ইলিয়াসশাহী বংশের পতন ঘটিয়ে রাজা গণেশের উত্থান ঘটেছিল। সুতরাং গণেশ-পূর্ব মুসলিম শাসনকালে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা যে অব্যাহত ছিল তা দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার লিপি থেকে ধারণা করা যায়।

মধ্যযুগে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশের চিত্র সমকালীন মুদ্রা ও শিলালিপিতে নেই বললেই চলে। তবুও আলোচনার যোগসূত্র তৈরির জন্য প্রাথমিক সূত্র হিসাবে সমকালীন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়। বিশেষ করে মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্যসমূহ থেকে জানা যায় যে মুসলিম শাসন যুগে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশ অব্যাহত ছিল। মধ্যযুগের ধর্ম-সংস্কৃতির বিস্তারিত রূপ অঙ্কিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাংলার সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের দিকগুলোর প্রতিফলন দেখা যায়। শৈবধর্ম ছিল এ সময় বাংলার অভিজাত হিন্দুর ধর্ম। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা সাধারণত শক্তির পূজারী ছিল। অর্থাৎ তারা ছিল শাক্তধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশে মনসা পূজা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। বিশেষত মনসা নিম্নশ্রেণীর মানুষের দেবী। অভিজাত বৈশ্যদের কাছ থেকে তিনি ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে পূজা লাভ করতে চান।[৬৪] বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতির অঙ্গনে মনসা পূজা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

মুসলিম মুদ্রায় হিন্দু সংস্কৃতি প্রভাবিত হওয়ায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠার ইঙ্গিত আগেই লক্ষ করা গিয়েছে। এরই সমর্থন পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সুফি-সাধকদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তাই কাব্যের শুরুতেই বন্দনায় হিন্দু দেবদেবীর পাশে পীর-দরবেশদের কথাও উল্লেখ করতে দেখা যায়।[৬৫] হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার সম্প্রীতির কথা মঙ্গলকাব্যগুলোতেও সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। কবি বিজয়গুপ্ত মুসলমান শাসকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাঁর কাব্যে। তিনি জানাচ্ছেন যে, সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলার প্রজারা অতি সুখে দিন অতিবাহিত করত এবং রাজা হুসেন শাহ ছিলেন রামতুল্য শাসক।[৬৬] প্রথম যুগের মুসলমান সুলতানদের মুদ্রায় হিন্দু প্রতীকের ব্যবহার এই অবস্থার একটি প্রেক্ষাপটই যেন তৈরি করেছিল।

সাম্প্রতিক গবেষণায় সোনারগাঁওয়ের গুরুত্ব

চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই সমগ্র বাংলায় মুসলমান সুলতানদের তিনটি শাসন কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথমটি উত্তর বাংলার লখনৌতি (বর্তমান পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলা), দ্বিতীয়টি সাতগাঁও (পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চল) এবং তৃতীয়টি পূর্ব বাংলার সোনারগাঁও। মুদ্রা প্রমাণে জানা যায় সুলতান শামসউদ্দিন ফিরুজ শাহের সময়

www.pathagar.com

(১৩০১-১৩২২ খ্রি.) সোনারগাঁও প্রথম মুসলিম শাসনাধীনে আসে। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা 'হযরত সুনারগাঁও' টাকশাল থেকে জারি হয়েছিল। সোনারগাঁওয়ের শাসক বাহরাম খানের বর্মরক্ষক 'ফখরা' ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহ করেন এবং এসময় ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ নাম নিয়ে তিনি সোনারগাঁওয়ে স্বাধীন সুলতানি শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এরই ধারাক্রমে ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পুরো বাংলায় স্বাধীন সালতানাত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সোনারগাঁও টাকশাল থেকে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রাও জারি হয়েছিল। এই সুলতানি শাসন যুগেই সোনারগাঁও এক সময় রাজধানীর মর্যাদা পায়।

কিন্তু প্রত্নসূত্র অবলম্বনে ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত না হওয়ায় সোনারগাঁওয়ের মর্যাদা ও গুরুত্ব তেমনভাবে উন্মোচিত হয়নি। গত শতকের নব্বইয়ের দশকে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক সোনারগাঁও ক্ষেত্রভূমিতে সীমিত গবেষণা করেছেন। তাতে সোনারগাঁওয়ের গুরুত্ব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নতুন দৃশ্যপটের উন্মোচন ঘটেছিল।[৬৭]

বাংলার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সোনারগাঁও সুলতানি যুগে কখনো ছিল শিল্প-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, আবার কখনো লাভ করেছিল রাজধানী শহরের মর্যাদা। সোনারগাঁও বর্তমান ঢাকা শহর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় আঠার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তের শতকের শুরুতে বখতিয়ার খলজির হাতে নদীয়া পতনের পূর্বে সোনারগাঁও (তৎকালীন সুবর্ণগ্রাম) ছিল সেন শাসকদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র। নদীয়ার পতনের পর লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গ চলে আসেন এবং বিক্রমপুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। এসময় সোনারগাঁও ছিল বিক্রমপুরের অধীনস্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। মিনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনা অনুযায়ী ১২৬০ সালেও বঙ্গ লক্ষ্মণ সেনের উত্তরাধীকারীদের হাতে ছিল। কিন্তু সে সময় সোনারগাঁওয়ের নাম উল্লিখিত হয়নি। বাংলার একাংশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক শতক পরেও সোনারগাঁও থেকে কোনো মুদ্রা জারির প্রমাণ নেই।

কতগুলো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সুলতানি যুগে বাংলায় নগরের বিকাশ ঘটেছিল। বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় নগর বিন্যাসের গতিধারায় একটি নতুন রূপ দেখা যায়। নতুন প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যে স্থিতিশীলতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত রাজধানী পরিবর্তিত হতে থাকে। একই সঙ্গে নতুন নতুন শহরের পত্তন হয়।

'খিত্তা' নামে দুর্গ সুরক্ষিত শহর যেমন ছিল, আবার 'কসবাহ' নামে প্রাচীরবিহীন শহরও ছিল। গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে সুলতানগণ প্রতিষ্ঠা করতেন টাকশাল। শিল্প বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র রূপে বিবেচিত হতো শহরগুলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদীর সান্নিধ্যে শহর গড়ে তুলতে উৎসাহ দিত। এই শহর কেন্দ্রিক বন্দরের মাধ্যমে। বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেত।

এই বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকাংশই সুলতানি যুগের শহর সোনারগাঁওয়ে পাওয়া যায়। এই শহরটির গুরুত্ব ও গতিশীলতার সন্ধান লাভ করা যায় সমকালীন মুদ্রা ও শিলালিপি বিশ্লেষণে, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে আর সুফি সাধকদের আগমন সূত্র থেকে।

সুলতানি যুগের শহরের অবস্থানকে নিশ্চিত করতে মুদ্রা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে। মধ্যযুগ-পূর্ব বাংলায় কোনো মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কিনা তা জানা যায় না। ভারতের মুদ্রার ইতিহাসে বাংলার বিশেষ মর্যাদা এই জন্য যে মধ্যযুগে এখানে একটি জাতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[৬৮] কেবল সরকার ব্যবস্থা পরিচালনার কেন্দ্রগুলো থেকেই মুদ্রা জারি করা হতো না, অনেক ছোট শহরেও টাকশালের অস্তিত্ব

www.pathagar.com

ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। উত্তর ভারতে ভৌগোলিক কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুবিধাজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মকাণ্ড কয়েকটি নির্দিষ্ট শহরেই সীমাবদ্ধ থাকত। অপরপক্ষে পর্যাপ্ত নদীর দেশ এই বাংলায় শাসনকর্তাগণ সহজলভ্য নৌপথের সুবিধার জন্য প্রয়োজন মতো রাজধানী স্থানান্তর করতে পারতেন। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি অনুভূত হয়। শাসনকর্তা বা সুলতানগণ নদীপথে ভ্রমণ করার সময় অনেক নতুন শহর পরিদর্শন করতেন এবং সমস্ত শহর থেকে প্রায়শই মুদ্রা জারি করতেন।[৬৯]

সোনারগাঁও টাকশাল শহরের মর্যাদা পেয়েছিল। বেশ কিছু সংখ্যক সুলতানি মুদ্রায় টাকশাল হিসাবে সোনারগাঁওয়ের নাম পাওয়া যায়। শামসউদ্দিন ফিরুজ শাহ থেকে শুরু করে সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯৪ খ্রি.) পর্যন্ত সোনারগাঁও টাকশাল হতে মুদ্রা জারি হয়েছে। অতঃপর জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহের (১৪১৮-১৪৩৩ খ্রি.) শাসনকালে আবার সোনারগাঁও টাকশাল থেকে মুদ্রা জারি করা হয়েছে। নলিনীকান্ত ভট্টাশালী সোনারগাঁওয়ের মুদ্রা অঙ্কনশিল্পীদের দক্ষতা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে এখানকার মুদ্রাগুলোর আকৃতি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। লিপিগুলো ছিল স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। পঠনের ক্ষেত্রেও এগুলো ছিল অনেক সহজ।[৭০] লখনৌতির পর সোনারগাঁওই ছিল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ টাকশাল শহর।

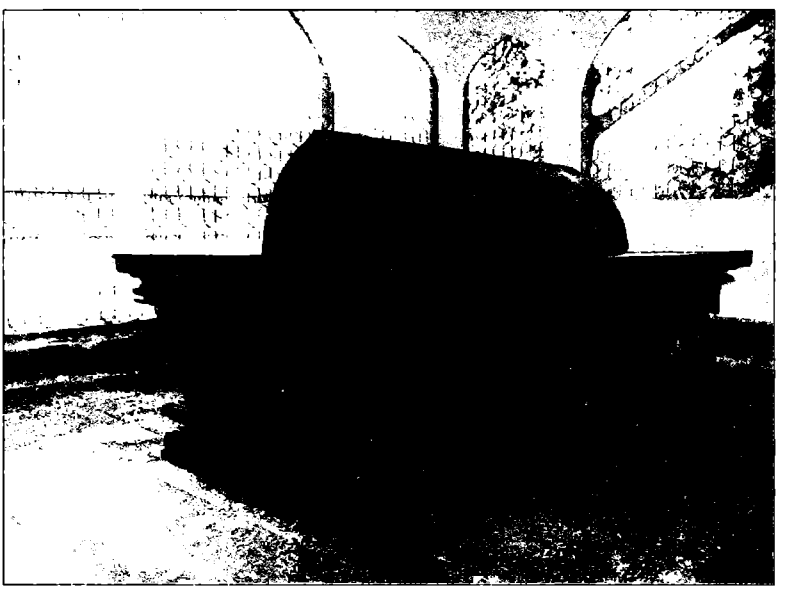

চিত্র-৮: সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি

মুদ্রা প্রমাণে ধারণা করার অবকাশ আছে যে, সুলতানি যুগে শহর সোনারগাঁওয়ের আকৃতি বেশ বড় ছিল। চারদিকের সীমান্তের অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল নদী দ্বারা আবৃত। ফলে সামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব সোনারগাঁওকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

www.pathagar.com

সোনারগাঁওয়ের দক্ষিণে প্রবাহিত বিশাল মেঘনা নদী, দক্ষিণ-পশ্চিমে ধলেশ্বরী নদী আর পশ্চিম দিকে ঢাকা থেকে সোনারগাঁওকে আড়াআড়িভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে শীতলক্ষ্যা নদী। উত্তর ও পূর্ব দিকের সীমান্ত ধরে চলেছে ব্রহ্মপুত্রের ধারা।

সোনারগাঁও ছাড়াও সুলতানি মুদ্রায় আরো দুটো টাকশালের নাম পাওয়া যায়। একটি 'বঙ্গ' আরেকটি 'মুয়াজ্জমাবাদ'। এই দুটো টাকশাল শহর সোনারগাঁওয়ের সীমারেখার ভেতর সম্পৃক্ত বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং ধারণাটি নিশ্চিত হলে সোনারগাঁওয়ের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।

সুলতান শামসউদ্দিন ফিরুজ শাহের মুদ্রায় কেবল টাকশাল শহর হিসাবে অস্পষ্টভাবে 'বঙ্গ' নামটি যুক্ত রয়েছে।[৭১] বঙ্গ সত্যিকার অর্থেই যে একটি টাকশাল শহর ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ পূর্ববঙ্গ বুঝাতে 'বঙ্গ' নামটি ব্যবহার করতেন। রুকনউদ্দিন কায়কাউস (১২৯১-১৩০০ খ্রি.) মুদ্রা জারির স্থান হিসাবে 'বঙ্গের ভূমি রাজস্ব' কথাটি ব্যবহার করেছেন।[৭২] ৭০৫ হিজরির মুদ্রায় সোনারগাঁও নামটি উৎকীর্ণ ছিল। এতে মনে করা হয় বঙ্গ নামে কোনো শহর ছিল না। পূর্ববঙ্গে মুসলিম বিজয়ের শুরুতে বঙ্গ একটি অঞ্চল বিশেষ ছিল এবং সেই কারণেই বঙ্গ নামটি মুদ্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক শহর সোনারগাঁও মুসলিম অধিকারভূক্ত হওয়ার পর বঙ্গ এই অঞ্চলের সমার্থক হিসাবেই ব্যবহৃত হতে থাকে।[৭৩] সুলতান শামসউদ্দিন ফিরুজ শাহের সময় বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় সীমারেখা সিলেট পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়।[৭৪] তিনি বঙ্গ ও সোনারগাঁও টাকশাল থেকে মুদ্রা জারি করেছিলেন।[৭৫]

বঙ্গ নামে কোনো শহরকে নির্দিষ্ট করা না গেলেও আমাদের মনে হয় মুদ্রায় উল্লিখিত বঙ্গ সোনারগাঁও অঞ্চলের অন্তর্গত কোনো স্থান হবে। এর সমর্থনে ইতালির পর্যটক ভারথেমা ও পর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসার বিবরণী বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ভারথেমা ১৫০৩ থেকে ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এশিয়ার অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি এই ভ্রমণের অংশ হিসাবে মায়ানমারের টেনাসেরিম বন্দর থেকে বাংলাদেশের একটি শহরে আসেন। শহরটির নাম তিনি 'বেংঘলা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৬] এই 'বেংঘলা' শহরের অবস্থান নিশ্চিত করা যায় নি। উচ্চারণগত দিক থেকে বলা যায় ভারথেমা বাংলা নামের কোনো শহরের কথা বলেছেন। অনেকের মতে শহরটি চট্টগ্রামের নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলে অবস্থিত হবে।[৭৭] এর পেছনে হয়তো দু'টো যুক্তি কাজ করেছে। প্রথমটি, ভারথেমা এদেশে প্রবেশ করেছেন মায়ানমার হয়ে। আর চট্টগ্রাম হচ্ছে মায়ানমার সীমান্তে প্রতিবেশী অঞ্চল। অন্যদিকে তিনি এই শহরের বন্দরে অনেক জাহাজ দেখেছেন যেগুলো রপ্তানির জন্য প্রচুর মাল বোঝাই করছিল। এ থেকে হয়তো ধারণা করা গিয়েছে ভারথেমা সমুদ্র বন্দরের কথা বলেছেন। যা চট্টগ্রামের নিকট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ জাতীয় ধারণা থেকে সিদ্ধান্তে আসায় সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, ভারথেমা টেনাসেরিম থেকে সমুদ্র পথে ৭০০ মাইল দূরত্ব ১১ দিনে অতিক্রম করে বেংঘলায় পৌঁছেন। চট্টগ্রামের নিকটবর্তী কোনো শহর হলে ভারথেমার এত দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো না। সোনারগাঁওয়ের সীমান্ত পর্যন্ত এই ভ্রমণ প্রলম্বিত করলে উল্লিখিত দূরত্বের গ্রহণযোগ্য নিষ্পত্তি সম্ভব হতো। দ্বিতীয়ত, সে যুগে মেঘনার তীরে সোনারগাঁও বন্দরে সামুদ্রিক জাহাজ নোঙর করত। ইবনে বতুতা চৌদ্দ

www.pathagar.com

শতকের প্রথমার্ধেই সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন। তাকে বহনকারী সামুদ্রিক জাহাজ সোনারগাঁওয়ের বন্দরে ভিড়েছিল। ইবনে বতুতার ভ্রমণের প্রাসঙ্গিক বিবরণ এভাবে উল্লেখ করা যায় '...কালিকট বন্দর থেকে তাঁর জাহাজ আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর দিয়ে মালদ্বীপের দিকে অগ্রসর হয়। মালদ্বীপ থেকে ফিরে আসেন মেবার ও মালাবারে। সেখান থেকে আবার ফিরে যান মালদ্বীপ। এভাবে ভারত মাহাসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করেন এবং পশ্চিম বঙ্গের সাতগাঁওয়ে আসেন।...এ পর্যায়ে এক সময় তিনি সোনারগাঁওয়ে পৌঁছেন। তাঁর জাহাজ সোনারগাঁও থেকে মেঘনা ও পদ্মা নদী ধরে ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে চট্টগ্রামে পৌঁছেছিল।'[৭৮] সুতরাং ধারণা করা যায় ভারথেমার দেখা সামুদ্রিক জাহাজে সোনারগাঁওয়ের বন্দরে রপ্তানির উদ্দেশ্যে মাল বোঝাই হতে সমস্যা নেই। এই ধারণা আরও স্পষ্ট করা যায় ভারথেমার বক্তব্যেই। তিনি 'বেংঘলা' শহরে সূতী কাপড়ের প্রাচুর্য দেখেছেন। আর দেখেছেন এ সমস্ত বস্ত্র শহরের পুরুষেরা বয়ন করে।[৭৯] সুলতানি যুগে চট্টগ্রামে ও তার আশেপাশে বস্ত্র বয়নশিল্প গড়ে উঠার কথা জানা যায় না। অন্যদিকে সোনারগাঁওয়ের সূতী বস্ত্র বয়নশিল্পের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। তাই স্বাভাবিক কারণেই ভারথেমা বেংঘলা শহরে যে বস্ত্র বয়ন শিল্প দেখেছেন তা সোনারগাঁওয়ের সঙ্গে অভিন্ন বলেই ধারণা করা যায়। পাশাপাশি ভারথেমা তাঁর দেখা বেংঘলা শহরকে বসবাসের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর বলে উল্লেখ করেছেন।[৮০] একইভাবে সোনারগাঁওয়ের ধন-ঐশ্বর্য ও সহজলভ্য দ্রব্যের কথা বলেছেন ইবনে বতুতা (১৩৪৫-৪৬ খ্রি.) এবং ইংরেজ বণিক রালফ ফিচ্ (১৫৮৩-১৫৯১ খ্রি.)।[৮১]

এই বিশ্লেষণ থেকে বেংঘলা, বাঙলা ও বঙ্গকে অভিন্ন ভাবা যায় এবং এগুলো যেহেতু দেশ নয়, শহর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, তাই বিভিন্নভাবে তাকে সোনারগাঁওয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করার অবকাশ রয়েছে। ফলে সিদ্ধান্তে আসা যায় 'বঙ্গ' (বেংঘলা, বাঙালা) শহর সোনারগাঁওয়ের একটি সম্প্রসারিত অংশ ছিল।

এবার 'মুয়াজ্জমাবাদ' প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। মুয়াজ্জমাবাদের সঠিক অবস্থান ইতিহাসে নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়নি। ব্লখম্যানের মতে 'ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ' মেঘনা থেকে উত্তর-পূর্বে ময়মনসিংহ এবং সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলব্যাপী অবস্থিত ছিল। তবে তিনি 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 'মহাল মুয়াজ্জমপুর'কে মুয়াজ্জামাবাদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন।[৮২] সুলতান সিকান্দার শাহের মুদ্রায় সর্বপ্রথম টাকশাল শহর হিসাবে মুয়াজ্জামাবাদের নাম পাওয়া যায়। মুয়াজ্জমাবাদ টাকশালের নামে উৎকীর্ণ সিকান্দার শাহের প্রথম মুদ্রায় তারিখ ছিল ৭৬০ হিজরি। মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী ধারণা করা হয়েছে, সিকান্দার শাহই এই শহরের পত্তন করেছেন এবং নিজের উপাধি 'আলমুয়াজ্জম' অনুসারে নামকরণ করেন মুয়াজ্জমাবাদ; পরে এই শহরটি মর্যাদার দিক থেকে সোনারগাঁওয়ের সমকক্ষ হয়ে পড়ে।[৮৩]

ব্লখম্যান যে ইঙ্গিত করেছেন আমাদের মনে হয় তার ভেতর সত্য নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ সোনারগাঁওয়ের অন্তর্গত মুয়াজ্জমপুরই সম্ভবত মুয়াজ্জমাবাদ। আমাদের সংগ্রহে কিছু তথ্যের সন্ধান রয়েছে। এর মাধ্যমে এরূপ সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করার অবকাশ পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ শাহের সময়ের একটি এবং আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের সময়ের দুটি শিলালিপিতে স্পষ্টত মুয়াজ্জমাবাদের উল্লেখ রয়েছে। সুলতান ফতেহ শাহের সময় সোনারগাঁওয়ের মোগরাপাড়া অঞ্চলের একটি মসজিদের গায়ে সংযুক্ত একটি শিলালিপিতে মুয়াজ্জমাবাদের নামটি উৎকীর্ণ ছিল। শিলালিপি থেকে জানা যায়, মসজিদটি মুয়াজ্জমাবাদের ওয়াজির তথা সেনাপতি কর্তৃক নির্মিত। শিলালিপি উৎকীর্ণের সময়কাল ৮৯৮ হিজরি (১৪৮৪ খ্রি.)। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময় হযরত শাহজালাল শাহের দরগার ইমারতে স্থাপিত একটি শিলালিপিতেও নির্মাতা হিসাবে জনৈক খালিশ খানের নাম পাওয়া যায়। নির্মাণ তারিখ ৯১১ হিজরি (১৫০৫ খ্রি.)। এই শিলালিপিতে ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদের সেনাপতি তথা ওয়াজিরের কথা উদ্ধৃত রয়েছে।[৮৪] ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদের কথা বলতে গিয়ে ব্লখম্যান উল্লেখ করেছেন যে, সিলেটের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল 'লাওদ' বা 'লাউর' নামক স্থানে ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদের সেনাপতি কর্তৃক মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৫] এ থেকে ধারণা করা চলে এ অঞ্চল মুয়াজ্জমাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হুসেন শাহের সময় সোনারগাঁওয়ের একটি মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিতেও ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদের উল্লেখ রয়েছে।[৮৬] মসজিদটি ৯১৯ হিজরিতে (১৫১৩ খ্রি.) জনৈক খাওয়াস খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। ব্লখম্যান মুয়াজ্জমাবাদের সীমা চিহ্নিত করেছেন মেঘনা নদী থেকে উত্তর-পূর্বে ময়মনসিংহ এবং সুরমা নদী দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল।[৮৭]

সুতরাং সোনারগাঁওয়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপির সাক্ষ্য এবং ব্লখম্যানের উদ্ধৃতি মুয়াজ্জমাবাদকে সোনারগাঁওয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে উল্লেখ করেছেন। নিম্নের বিশ্লেষণ এর অবস্থানকে আরও নির্দিষ্ট করছে।

'মহাল মুয়াজ্জমপুরে' একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত দরগাহের কথা ব্লখম্যান 'জেমস ওয়াইজে'র কাছে শুনেছিলেন। এটি ছিল 'শাহ লঙ্গর' নামে এক সাধকের সমাধি।[৮৮] এই দরগাহ সংলগ্ন একটি মসজিদ রয়েছে যা শামসউদ্দিন আহমদ শাহের সময় (১৪৩১-১৪৪২ খ্রি.) নির্মিত হয়। এতে ধারণা করা হয় সাধক শাহ লঙ্গর শামসউদ্দিন আহমেদ শাহের সমসাময়িক ছিলেন।[৮৯]

বর্তমানে শাহ লঙ্গরের দরগাহ ও দরগাহ সংলগ্ন মসজিদকে চিহ্নিত করা যায়। ফলে মুয়াজ্জমপুরের অবস্থান সম্পর্কে সংশয়ের অবসান ঘটেছে। বর্তমান সোনারগাঁও থানাকেন্দ্র থেকে আনুমানিক ৯/১০ কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত এই থানার সীমান্ত ইউনিয়নটির নাম জামপুর। ক্ষীণতোয়া ব্রহ্মপুত্রের ধারা বয়ে গিয়েছে বাজারের ধার ঘেঁষে। তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে শাহ লঙ্গরের প্রাচীন দরগাহ। কালের বিবর্তনে সাধকের নামের বিকৃতি এসেছে। স্থানীয় লোকেরা বলে শাহ আলমের দরগাহ। দরগাহর সামনেই রয়েছে সুলতান শামসুদ্দিন আহমদ শাহের তৈরি মসজিদটি। এলাকাটির স্থানীয় নাম 'মজমপুর'। সুতরাং টাকশাল শহর মুয়াজ্জমাবাদের অবস্থান সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তি করা যায় এভাবে :

ক. বর্তমানের 'মজমপুর' মুয়াজ্জমপুরেরই বিকৃত উচ্চারণ। শাহ লঙ্গরের দরগাহ ও দরগাহ সংলগ্ন মসজিদ মুয়াজ্জমপুরের অবস্থান নিশ্চিত করছে।

www.pathagar.com

খ. ব্লখম্যান 'ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ' ও 'মহাল মুয়াজ্জমপুর' অভিন্ন বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। শুধু স্থানটির অবস্থানকে নির্দিষ্ট করেননি। তিনি বলেছেন স্থানটির অবস্থান মেঘনা থেকে উত্তর-পূর্বে এবং ময়মনসিংহ ও সুরমা নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত। শাহ লঙ্গরের দরগাহ প্রসঙ্গে জেমস ওয়াইজের উদ্ধৃতি দেয়ায় ধারণা করা যায়, ব্লখম্যান এই অঞ্চলটিতে নিজে আসেননি। ফলে মুয়াজ্জমাবাদের (মুয়াজ্জমপুর) সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে তাঁকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকতে হয়েছে। শিলালিপির সাক্ষ্যে দেখা গিয়েছে মুয়াজ্জমাবাদের উজিরের আধিপত্য সিলেট পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল। এতে শহর সোনারগাঁওয়ের প্রান্ত সীমানায় মুয়াজ্জমাবাদের মূলকেন্দ্র স্থাপন হতে বাধা নেই। বিশেষ করে ব্লখম্যানের সীমা নির্দেশের সঙ্গে অভিন্ন বর্তমান মজমপুর অঞ্চলটিও মেঘনা নদীর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

গ. ব্লখম্যানের উদ্ধৃতি অনুযায়ী এখনও মজমপুরের অবস্থান লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝামাঝি।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। মুসলিম শাসন যুগের বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা বিশ্লেষণ করে সোনারগাঁও ও মুয়াজ্জমাবাদ সমস্যার নিষ্পত্তিতে উপরের সিদ্ধান্তকে আরও যুক্তি নির্ভর করা যায়। সোনারগাঁওয়ে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুলতান সিকান্দার শাহের শাসনকাল পর্যন্ত সোনারগাঁও টাকশাল কার্যকর ছিল। এই টাকশাল থেকে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর, দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক, ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ, সুলতান ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও সুলতান সিকান্দার শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রা উৎকীর্ণের তারিখ হিজরি ৭২৮, (৭৩৩, ৭৩৪), (৭৩৯-৫০), (৭৫০, ৭৫১, ৭৫৩), (৭৫৩, ৭৫৮), (৭৫৬-৭৬০, ৭৬৩)।[৯০]

সুলতান সিকান্দার শাহ ৭৬০, ৭৬১ ও ৭৬৪, ৭৭৭ হিজরিতে মুদ্রা জারি করেছেন নতুন টাকশাল মুয়াজ্জমাবাদ থেকে।[৯১] ইলিয়াস শাহের পর বাংলার ক্ষমতায় বসেন তাঁর পুত্র গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ। এ সময় থেকে পরবর্তী দীর্ঘদিন পর্যন্ত সোনারগাঁও টাকশাল থেকে আর মুদ্রা জারির প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর স্থান দখল করে 'ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ'। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সোনারগাঁওয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলার স্বাধীন সালতানাতের সূচনা করেছিলেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ। এই সুলতান ও তার পুত্র ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহের পর সুলতান আজম শাহের সময়েই অন্যতম রাজধানীর মর্যাদা পায় সোনারগাঁও। অথচ সুলতান আজম শাহের সময় থেকে সুলতান আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহের সময়কাল পর্যন্ত (১৩৮৯-১৪১৪ খ্রি.) সোনারগাঁও টাকশাল থেকে কোনো মুদ্রা জারির প্রমাণ নেই। রাজধানী শহরের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে টাকশাল না থাকা একটি বিসদৃশ ব্যাপার। আবার আজম শাহের সময় থেকে সুলতানি যুগের প্রায় সমুদয় সময়কালেই মুয়াজ্জমাবাদ টাকশাল থেকে মুদ্রা জারি হয়েছে। সুতরাং এ থেকে সহজে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, সিকান্দার শাহের রাজত্বের শেষ দিকে সোনারগাঁওয়ের বক্ষভূমি থেকে টাকশাল সরিয়ে শহরের প্রান্ত সীমায় আনা হয়েছে। মুয়াজ্জমাবাদ টাকশালটি সেই সত্যই প্রকাশ করছে।

www.pathagar.com

এ সমস্ত যুক্তির আলোকে মুয়াজ্জমাবাদ শহরকে সোনারগাঁওয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হলে সোনারগাঁও শহরের গৌরব অনেক বৃদ্ধি পাবে।

মুদ্রা প্রমাণে মনে হয় শহর হিসাবে সোনারগাঁওয়ের মর্যাদা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ৭২৭-৭৩৫ হিজরি পর্যন্ত সোনাগাঁও টাকশাল থেকে মুদ্রা জারি করেন। এ সময় টাকশালের নাম ছিল 'শহর সোনারগাঁও'।[৯২] অর্থাৎ তখন একটি সাধারণ শহরের মর্যাদা ছিল দিল্লীর সুলতানদের নিকট। ৭২৮ হিজরিতে মোহাম্মদ বিন তুঘলক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে সোনারগাঁওয়ের গভর্নর হিসেবে পাঠান। একজন গভর্নরের অধীনে থাকায় সোনারগাঁওয়ের গুরুত্ব এ সময় হয়তো কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কারণ গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরের মুদ্রায় টাকশালের নাম 'শহর সোনারগাঁওয়ে'র পরিবর্তে 'হযরত সোনারগাঁও' উৎকীর্ণ হতে থাকে।[৯৩] এ সময় সোনাগাঁওকে বলা হচ্ছে 'হযরত' অর্থাৎ 'মর্যাদাবান'। এরপর সুলতান শামসউদ্দিন ফিরুজশাহ ও তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের মুদ্রাতেও 'হযরত সোনারগাঁও' উৎকীর্ণ করা অব্যাহত থাকে।[৯৪] সোনারগাঁওয়ের গুরুত্ব আরেকবার বৃদ্ধি পায় ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের সময়। এ সময় স্বাধীন সুলতানির সূচনা ঘটে এই সুলতানের মাধ্যমে। ফখরুদ্দিনের মুদ্রায় টাকশালের নাম লিখিত হয় 'হযরত জালাল সোনারগাঁও'।[৯৫] অর্থাৎ সোনারগাঁওকে তখন বিশেষ সম্মানিত অঞ্চল বলা হয়েছে। এর পর থেকে 'হযরত জালাল' লেখা অব্যাহত থাকে।

অর্থাৎ সোনারগাঁওকে বিশেষিত করার মধ্যদিয়ে শহর হিসাবে এর গুরুত্ব নির্দেশিত হয়েছে। অন্যদিকে 'ইকলিম' বিশেষণটি যুক্ত হয়েছে মুয়াজ্জমাবাদের সঙ্গে। 'ইকলিম' জেলার সমার্থক অর্থাৎ ধারণা করা যায় সোনারগাঁওয়ের একটি জেলা শহরের মর্যাদা নিয়ে মুয়াজ্জমাবাদের অবস্থান ছিল।

সোনারগাঁওয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ এই নগরীর গুরুত্বকে নিশ্চিত করেছে। মুসলিম সমাজ বিকাশ নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সোনারগাঁও শিক্ষা, বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।[৯৬]

সোনারগাঁওয়ের মোগরাপাড়া মসজিদের নিকট ৮৮৯ হিজরি অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি পাওয়া যায়।[৯৭] নির্মাতার মূল নাম শিলালিপি থেকে মুছে গেলেও তার উপাধি ও মর্যাদার উল্লেখ রয়েছে। তাতে তাঁকে মুয়াজ্জমাবাদের প্রধান সেনাপতি ও থানা লাওদের সেনাধ্যক্ষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই একই ব্যাক্তি সোনারগাঁওয়ে মসজিদ নির্মাণ করে থাকলে সিদ্ধান্ত নেয়ায় কোনো বাঁধা নেই যে তাঁর শাসিত অঞ্চল, বিশেষত মুয়াজ্জমাবাদ থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত সম্প্রসারিত শহরে মুসলিম সমাজ কাঠামো সংহত রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

সুফি-সাধকগণ তাঁদের অবস্থানকেন্দ্রে শিক্ষা বিস্তারের পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। এদিক থেকে সোনারগাঁওয়ের ঔজ্জ্বল্য ছিল। নাগরিক জীবনের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সুলতান এবং কর্মকর্তাদের ভূমিকাও ছিল লক্ষণীয়। সোনারগাঁওয়ে নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহের সময়কালে একটি মসজিদ নির্মাণের স্মারক শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। লিপি উৎকীর্ণকাল ৯২৯ হিজরি অর্থাৎ ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দ। লিপিভাষ্যে মসজিদ নির্মাতা হিসাবে 'মালিক-উল-উমারা-আল-ওয়াজারা'র নাম উল্লিখিত হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে প্রধান আইনবিদ ও হাদিসের শিক্ষক।[৯৮] এ সময় স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের পণ্ডিতদের অনুকূলে সোনারগাঁও অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। মুসলিম আগমনের

www.pathagar.com

পর থেকেই সোনারগাঁওয়ের সাংস্কৃতিক খ্যাতির কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। হানাফী আইনবিদ শয়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা আনুমানিক ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে এসেছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত এই সুফির প্রতি সাধারণ মানুষ খুব বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়লে তৎকালীন দিল্লীর সুলতান ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও চলে যেতে অনুরোধ করেন। বাংলায় আসার পথে সুফি বিহারের অন্তর্গত মানের শহরে অবস্থান করেন এবং শয়খ ইয়াহিয়া মনেরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। শায়খ ইয়াহিয়ার বালক পুত্র শরফুদ্দিনের ব্যুৎপত্তিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে নিজ শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। শরফউদ্দিনও গুরুর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি আবু তাওয়ামার সঙ্গে সোনারগাঁও আসেন। এখানে এসে তাঁরা একটি মাদ্রাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন এবং ইসলাম প্রচারে মনোযোগ দেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে সোনারগাঁও অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কারণ সোনারগাঁও অঞ্চল তখনও মুসলিম অধিকারে আসেনি বা মাত্র মুসলিম অধিকারে আসার পথে। সুতরাং সেখানে ইসলাম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। অনেক মুসলমান ছাত্র তাঁর মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন এবং খানকায় অনেক দুস্থ ও দরিদ্রের অন্ন-সংস্থান হতো।[৯৯]

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার একটি যোগসূত্র রয়েছে। সোনারগাঁওয়ের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন তাই এই শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা নির্দেশ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুদ্রা। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা মধ্যযুগের বাঙালির বিনিময়ের মাধ্যম ছিল। আব্বাসীয় সভ্যতা ছিল প্রধানত নগর সভ্যতা। যা মূলত নির্ভরশীল ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের উপর। নগর কেন্দ্রসমূহ বা শহর বন্দরের মুদ্রার প্রয়োজন বেশি অনুভূত হয়। কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এ সমস্ত অঞ্চলে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতো।[১০০]

সুলতানি যুগে সীমিতভাবে স্বর্ণ ও ব্যাপকভাবে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করে মুদ্রা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করা হয়। বাংলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মতো সোনারগাঁও (বঙ্গ ও মুয়াজ্জমাবাদ) অঞ্চলে টাকশাল শহর গড়ে ওঠা এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারের কথা প্রমাণ করে। একই সঙ্গে এই অঞ্চলে নৌ সুবিধার কারণে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন। ইবনে বতুতা সোনারগাঁওয়ের সমৃদ্ধির কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে ভারথেমার বক্তব্য আমরা পরীক্ষা করেছি। পর্তুগীজ পর্যটক ডুয়ার্তে বারবোসা (১৫০০-১৫১৭ খ্রি.) বাংলাদেশে বহু বন্দর ও নগরী দেখেছিলেন যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য চলত ও কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি হতো।[১০১] আমরা আগেই বলেছি, সোনারগাঁওয়ের সুতী বস্ত্রের খ্যাতি বিশ্বজোড়া ছিল। তাই অনুমান করা চলে, বারবোসা কার্পাস বস্ত্র রপ্তানির কথা বলে সোনারগাঁও বন্দরের কথাই উল্লেখ করেছিলেন।

উপরের আলোচনায় প্রত্নসূত্র বিশ্লেষণে সুলতানি যুগে শহর সোনারগাঁওকে আবিষ্কার করার চেষ্টা ছিল। সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণে যে সত্য বেরিয়ে এসেছে তাতে সুলতানি যুগে একটি সমৃদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ শহর হিসাবে সোনারগাঁওয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বঙ্গ' 'মুয়াজ্জমাবাদকে' সোনারগাঁওয়ের সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে আমাদের ধারণা হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্যের দিক থেকে সোনারগাঁও সুলতানি যুগে যে একটি উল্লেখযোগ্য শহরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে তেমন সন্দেহের অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

ঢাকা নগরীর প্রাচীনত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থা

মোগল সুবাদার ইসলামখান চিশতি ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় প্রশাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা হয় মোগল সুবার রাজধানী। এর আগে সুলতানি শাসনযুগে এবং বারোভূঁইয়াদের আমলে সোনারগাঁও ছিল শাসনকেন্দ্র। এ কারণে ১৬১০-এর পূর্বে ঢাকায় কোনো নাগরিক জীবন ছিল কিনা এ বিষয়ে গবেষকগণ সন্দিহান। সুনির্দিষ্ট তথ্য উপস্থাপন না করে কেউ কেউ মোগল-পূর্ব যুগে ঢাকায় একটি নগর নয়–জনপদের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করেছেন।[১০২] এভাবেই একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত প্রচলিত হয়েছে যে, ঢাকা নগরীর জন্ম সতের শতকে। এর আলোকে ঢাকা নগরীর ৪০০ বছর পূর্তি উৎসব পালনের উদ্যোগ কোথাও কোথাও গৃহীত হয়েছে বলে শোনা যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রত্নসূত্র বিশ্লেষণ ভিন্ন সাক্ষ্য দিচ্ছে। শিলালিপি সাক্ষ্য নিশ্চিত করছে ঢাকার কোনো কোনো অংশে নাগরিক জীবনের অস্তিত্ব ছিল পনের শতকের মাঝপর্বেই। অর্থাৎ সুলতানি শাসনযুগে।

সতের শতকের প্রথম দশকে ঢাকা মোগল রাজধানীর মর্যাদা পায়। সেই থেকে গড়ে ও বেড়ে উঠতে থাকে ঢাকা নগরী। মোগলদের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে *আইন-ই-আকবরী* বৃহত্তর ঢাকা জেলার অবস্থান সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মতে সরকার বাজুহা ও সরকার সোনারগাঁওয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঢাকার অবস্থান।[১০৩] অবশ্য সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে বলা যায় ইসলাম খান চিশতি কর্তৃক ঢাকায় মোগল রাজধানী প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই অঞ্চলটির নগর হিসাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ ছিল। এদিক থেকে সুলতানি যুগে ঢাকা নগরীর পত্তন এবং সেখানে শিক্ষা কাঠামোর স্বরূপ অন্বেষণ একটি কৌতূহলী প্রয়াস মাত্র। দুটো শিলালিপির সামান্য কিছু বক্তব্য প্রাথমিকভাবে কৌতূহলের উদ্রেক করিয়েছে। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এই লিপিভাষ্যগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে উন্মোচিত হয়েছে একটি নতুন দৃশ্যপটের সম্ভাবনা। তাতে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সুলতানি যুগে ঢাকা নগরীর অবস্থান এই অঞ্চলের শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করার।

এটি ঠিক যে মোগল-পূর্ব যুগে ঢাকা নগরীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য ঢাকা নগরীকে পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা ও পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সেন শাসনযুগে বিক্রমপুর যখন রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল তখন ঢাকার কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল সোনারগাঁও। সোনারগাঁও কেন্দ্রের অবস্থান শীতলক্ষ্যা নদীর আনুমানিক আট কিলোমিটার পূর্বে। বখতিয়ার খলজীর হাতে নদীয়া পতনের পূর্বে সোনারগাঁও ছিল সেনদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র। নদীয়া পতনের পর লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে চলে আসেন এবং বিক্রমপুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। সোনারগাঁও তখন বিক্রমপুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। মিনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনা অনুযায়ী ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দেও বঙ্গ লক্ষ্মণ সেনের উত্তরসূরিদের শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু তবকাত-ই-নাসিরীতে সোনারগাঁওয়ের নাম উল্লিখিত হয়। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর এক শতক পর্যন্ত সোনারগাঁও থেকে কোনো মুদ্রা জারির প্রমাণ নেই। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.) রাজত্বকালেই সোনারগাঁও সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনকেন্দ্রে পরিণত হয়।[১০৪] মধ্যযুগের শুরু থেকেই সোনারগাঁও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনকেন্দ্র। সুলতানি যুগে একটি

www.pathagar.com

শহরের অবস্থানকে নিশ্চিত করতে মুদ্রার সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের মুদ্রার ইতিহাসে বাংলার বিশেষ মর্যাদা এ জন্য যে, মধ্যযুগে এখানে একটি জাতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[১০৫] এ যুগে শুধুমাত্র সরকার ব্যবস্থা পরিচালনার কেন্দ্রগুলো থেকেই মুদ্রা অঙ্কন করা হতো না,–ছোট খাটো শহরেও টাকশালের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে সোনারগাঁওয়ের পশ্চিমে বর্তমান ঢাকা এবং ঢাকার কাছাকাছি কোনো অঞ্চলে টাকশালের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় না। সুলতানি যুগ অবসানের পর বারভূঁইয়াদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র ছিল সোনারগাঁও। ঈশাখাঁ এবং তাঁর পুত্র মুসাখাঁ শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন শীতলক্ষ্যার পূর্ব তীরে। বারভূঁইয়াদের দমন করার জন্যই ইসলাম খাঁকে ঢাকায় মোগল রাজধানী স্থাপন করতে হয়। শীতলক্ষ্যার পূর্বাঞ্চলে যে শক্তির উৎসভূমি তাকে কাছে থেকে মোকাবেলা করার জন্য ইসলামখাঁ স্বাভাবিকভাবেই নদীর পশ্চিমাঞ্চলকে নিজ অবস্থান হিসাবে বেছে নেন। সে কারণেই বারভূঁইয়াদের সঙ্গে ইসলামখাঁর শেষ নৌযুদ্ধ হয়েছিল শীতলক্ষ্যা নদীতে।

ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপট থেকে অন্তত অনুমান করার অবকাশ রয়েছে সুলতানি যুগে ঢাকায় নগরী পত্তনের কোনো সম্ভাবনা ও সুযোগ ছিল না। প্রাক-মোঘল বাংলায় ঢাকার রাজনৈতিক গুরুত্ব তেমন লক্ষ করা না গেলেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনুসন্ধান কয়েকটি দৃশ্যপটের ইঙ্গিত দেয়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা ঢাকা নগরীতে প্রাপ্ত দুটো শিলালিপি আলোচনা করার প্রয়াস পাব। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় খোদিত এই শিলালিপি দুটোর একটি থেকে স্পষ্টতই ধারণা করা যায় ঢাকা তখন ইকলিম মুবারকাবাদের অন্তর্গত ছিল।[১০৬] বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনাকারী ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সময় থেকেই তাঁর নামানুসারে ইকলিম মুবারকাবাদ নামটি ব্যবহৃত হতে থাকে। মুবারকাবাদের অবস্থান সম্পর্কে এইচ. ই. স্টাপল্টন যে ধারণা দিয়েছেন তার উদ্ধৃতি পাওয়া যায় ড. দানীর বক্তব্যে। পূর্ব বাংলার একটি বড় পরগণা ছিল মুবারকাবাদ।[১০৭] সুলতানি বাংলার শিলালিপিতে দুটো ইকলিমের নাম পাওয়া যায়। একটি ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ, যা বর্তমান সোনারগাঁওয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অন্যটি ইকলিম মুবারকাবাদ।[১০৮]

মোগল যুগের সরকার বাজুহার ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে ইকলিম মুবারকাবাদ অভিন্ন বলে মনে করা হয়। ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ ও ইকলিম মুবারকাবাদের অবস্থান সম্পর্কে একটি সারসংক্ষেপ এভাবে দাঁড় করানো যায় : মুয়াজ্জমাবাদ দক্ষিণ-পশ্চিমে সোনারগাঁও থেকে শুরু করে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে সিলেট পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। অন্যদিকে ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদের অন্তর্গত সোনারগাঁও ছিল ঢাকার কয়েক মাইল পূর্বে। স্টাপল্টনের বক্তব্য অনুযায়ী ঢাকা, ফরিদপুর, ধলেশ্বরীর দক্ষিণ,—এককথায় বৃহত্তর বিক্রমপুর ইকলিম মুবারকাবাদের অঙ্গীভূত ছিল।[১০৯] তাই এই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, সুলতানি যুগের শুরু থেকেই ইকলিম মুবারকাবাদের সীমান্ত অঞ্চল হিসাবে বর্তমান ঢাকার একাংশে মুসলিম সমাজ বিকাশের একটি অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

এবার আমাদের প্রস্তাবিত শিলালিপি দুটোর প্রসঙ্গে আসছি। প্রথম শিলালিপিটি ঢাকার নারিন্দায় একটি মসজিদের গায়ে সাঁটা রয়েছে।[১১০] দ্বিতীয়টি পাওয়া গিয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারের কিছুটা পশ্চিমে গিরিদিকিল্লা নামের মহল্লায় নাসওয়ালাগলি

www.pathagar.com

মসজিদের সম্মুখস্থ একটি তোরণের গায়ে।[১১১] মসজিদ বা তোরণের অস্তিত্ব এখন আর নেই। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে বজ্রপাতে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শিলালিপিটি প্রথমে ঢাকা কালেক্টরেটে ছিল। বর্তমানে তা জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।[১১২] নারিন্দার শিলালিপির সূত্রে জানা যায় মসজিদটি ৮৬১ হিজরি অর্থাৎ ১৪৫৬-৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। নাসওয়ালাগলির শিলালিপি উৎকীর্ণের সময়কাল জুন ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দ। সময়ের হিসাবে দুটো শিলালিপিই সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় উৎকীর্ণ। প্রথম শিলালিপির বক্তব্য বিষয় খুবই সীমিত। লিপি বিন্যাসে বোঝা যায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টিতে মসজিদের সম্মুখস্থ তোরণ নির্মাণের সাক্ষ্য রয়েছে। এটি সরকারি উদ্যোগে নির্মিত হওয়ায় সমকালীন সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হিসাবে খাজা জাহান নাম লেখা হয়েছে আর নির্মাণ অঞ্চল হিসাবে লেখা হয়েছে ইকলিম মুবারকাবাদ।

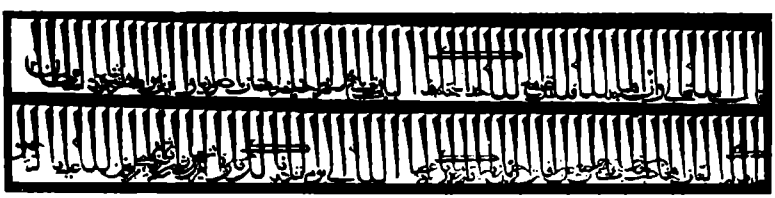

চিত্র-৯ : নাসওয়ালাগলি শিলালিপি

মসজিদ দুটোর অবস্থান পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় একটি সরল রেখায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটারের ব্যবধানে। ইতিপূর্বে ইকলিম মুবারকাবাদের ভৌগোলিক অবস্থান প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এই ইকলিমের সীমান্ত অঞ্চল ঢাকার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমেয় মসজিদ দুটো ইকলিম মুবারকাবাদের অধিভুক্ত অঞ্চলের ভেতর ছিল। পাশাপাশি ইকলিম নিশ্চিত করছে ঢাকার এই অংশে নাগরিক জীবনের স্পন্দন ছিল সুলতানি যুগের প্রথমার্ধেই।

নারিন্দায় প্রাপ্ত আলোচ্য প্রথম শিলালিপিতে নির্মাতার নাম ফার্সিতে লেখা হয়েছে। নিজেকে তিনি বিশেষিত করেছেন *মোসাম্মাৎ বখত বিনত, দুখতারে মারাহমাত গরিব* বলে, অর্থাৎ মারাহমাতের কন্যা দ্বীন দরিদ্র বখত বিনত এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। 'গরীব' শব্দ থেকে সৈয়দ আওলাদ হোসেন তাঁর *Notes on the Antiquities of Dacca* গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, বখত বিনত কোনো দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন।[১১৩] এই মন্তব্যে দ্বিমত পোষণ করেছেন অধ্যাপক আব্দুল করিম।[১১৪] তাঁর মতে গরিব শব্দে বখত

www.pathagar.com

বিনতকে অর্থগতভাবে দরিদ্র ভাবার কারণ নেই। বরঞ্চ এভাবে তিনি ব্যক্তিগত সৌজন্য প্রকাশ করেছেন। শামসউদ্দিন আহমদ তাঁর *Inscriptions of Bengal* (Vol-IV) গ্রন্থে আলোচ্য শিলালিপিটি বিশ্লেষণ করেছেন। শিলালিপিটির বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে এ যুগে মুসলিম সুলতান ও কর্মকর্তাগণ সাধারণত আরবি ভাষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরবির সঙ্গে ফার্সি শব্দের মিশেলে শিলালিপি উৎকীর্ণ করতেন। কিন্তু নারিন্দার এই শিলালিপির ভাষা ফার্সি। তুলনামূলকভাবে লিপিগুলোও অদক্ষ হাতে খোদিত।[১১৫] আমাদের মনে হয় এই একটি মাত্র যুক্তিতেই বখত বিনতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রথমত, শিলালিপিতে সমকালীন প্রথা অনুযায়ী সুলতান বা কর্মকর্তার নাম না থাকায় মসজিদটি যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়নি তা নিশ্চিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকারি রীতিতে আরবি শব্দ ব্যবহার না করে এ সময়ের সাধারণ মুসলমানের কাছের ভাষা ফার্সিকেই ব্যবহার করা হয়েছে লেখার মাধ্যম হিসাবে। তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত উদ্যোগে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলেই সরকারি দক্ষ লিপিকর দ্বারা শিলালিপি খোদিত না হওয়ায় তাতে অদক্ষতার ছাপ দৃশ্যমান হয়েছে।

অপরদিকে নাসওয়ালাগলির শিলালিপিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ঘোষণা রয়েছে। তাই দক্ষতার সঙ্গে তা খোদিত হয়েছে আরবি নাস্‌খ রীতিতে। আগেই বলা হয়েছে সুলতানের নামের সঙ্গে নির্মাতা হিসাবে খাজা জাহানের নাম উল্লিখিত আছে। তুঘলক যুগে দিল্লীতে প্রধান কর্মকর্তা বা উজিরকে খাজা জাহান উপাধি দেওয়া হতো। সাধারণভাবে সুলতানি যুগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপাধি ছিল খাজা জাহান। ধারণা করা হয় ইকলিম মুবারকাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন এই খাজা জাহান।[১১৬] সুতরাং শিলালিপি দুটি থেকে প্রাথমিকভবে অনুমান করা যায় ঢাকার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে পনের শতকের মাঝামাঝি সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে মসজিদ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে এই দৃষ্টান্ত সুলতানি যুগে ঢাকা নগরের বিকাশমান অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্তটি আধুনিক ইতিহাসবেত্তাদের চিন্তায়ও স্থান পেয়েছে।[১১৭]

এ পর্যন্ত সুলতানি যুগের প্রতিনিধিত্বকারী যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তার সিংহভাগেই মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এতে লক্ষ করা যায় সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ নির্মাণের স্থান ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমান জনবসতির সঙ্গে মসজিদ স্থাপনের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। তাই মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি মুসলমান সমাজের বিস্তৃতিকেই নির্দেশ করছে। মসজিদে সংস্থাপিত অনেক শিলালিপির ভাষ্যে সমকালীন সমাজচিত্র প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত হয়।

সুলতানি বাংলায় শিক্ষার স্বরূপ উদঘাটনকারী কোনো ব্যাপক গবেষণা রিপোর্ট পাওয়া যায় না। বাংলার শিক্ষা কাঠামোর ওপর ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর সর্বপ্রথম একটি সাধারণ চিত্র আমরা দেখতে পাই। এতে দেখা যায় এ সময় ধর্মীয় শিক্ষা ছিল মুসলমানদের শিক্ষার প্রধান বিষয়। মুসলিম শিক্ষায়তনে অংকের চেয়ে কুরআনের উপর জোর দেয়া হতো বেশি।[১১৮] অবশ্য সময়ের হিসাবে বলা যায় আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানের সময়কাল এই শিক্ষা কমিশনের আলোচিত সময়ের অনেক প্রাচীন। তবে কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই রিপোর্ট সুলতানি যুগের শিক্ষা কাঠামোর সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা

www.pathagar.com

প্রবর্তনের পূর্বে দুটো ধারায় এদেশের শিক্ষা কাঠামো প্রচলিত ছিল। প্রথমটি টোল ও মাদ্রাসায় যথাক্রমে সংস্কৃত এবং আরবি-ফার্সি শিক্ষার ধারা। ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর সদস্যরা এই ধারায় শিক্ষা গ্রহণ করত। দ্বিতীয়টি পাঠশালা ও মক্তবে সাধারণ শিক্ষার ধারা। এই দুই ধারার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন ছিল না, ধারা দুটো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ।[১১৯] বাংলাদেশে মুসলমানদের শিক্ষার ধারা ভারতবর্ষের সমকালীন ধারারই অনুসঙ্গী ছিল। মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলো মসজিদ বা দরগার সঙ্গেই সংযুক্ত হতো। এগুলোর ব্যয় নির্বাহে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করা যায়।[১২০] অবস্থাপন্ন মুসলমান পরিবারের সদস্যগণ তাদের ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ মনযোগ দিতেন। মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষালয়ে মোল্লাগণ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে শুধু হাতেখড়িই দেওয়া হতো না, সেখানে কুরআনও পড়ানো হতো। পরবর্তী ধাপে ছাত্রদের নির্দিষ্ট ধারা পছন্দের সুযোগ ছিল। এ সময় তারা দর্শন, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র অথবা কাব্য শিক্ষার সুযোগ লাভ করত। কিছু কিছু বিষয়ে দরিদ্র ঘরের ছেলে মেয়েরাও যোগ্যতা প্রদর্শন করত।[১২১] সুলতানি বাংলায় মসজিদগুলো সাধারণত মাদ্রাসা হিসাবেই ব্যবহৃত হতো।[১২২]

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেখা গিয়েছে পনের শতকে ইকলিম মুবারকাবাদের অংশ হিসাবে বর্তমান ঢাকার একাংশে নগরের অবস্থান ছিল। একই সঙ্গে উপরে আলোচিত শিলালিপি দুটো অন্তত দুটো মসজিদ নির্মাণের সাক্ষ্য বহন করে এই অঞ্চলে মুসলমান জনবসতি সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে। ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ সুলতানি যুগে মুসলিম সমাজ অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করত। এটি সামাজিক প্রথা হিসাবে দাঁড়িয়েছিল। ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় অভিন্ন ছিল মুসলিম শিক্ষার ধারা। মুসলমান পরিবারের সন্তানদের বয়স চার বছর চার মাস চার দিন হলে আনুষ্ঠানিকভাবে পড়াশুনোয় হাতেখড়ি দেওয়া হতো। একে বলা হতো 'বিসমিল্লাহখানি অনুষ্ঠান'।[১২৩] তাই বিবিধ বিবেচনায় আলোচ্য সময়কালে ঢাকার মুসলিম সম্প্রদায় মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষার ধারা গড়ে তুলেছিল বলে অনুমান করায় কোনো সমস্যা নেই।

ঢাকা নগরের আশে পাশে এর অনেককাল আগে থেকেই মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠা ও শিক্ষা বিস্তার ঘটার বিষয়টি ইতিহাসে প্রমাণিত। এ যুগে মীরপুর অঞ্চলকে ঢাকার উপকণ্ঠ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এখানে সুফি শাহ আলী বোগদাদীর সমাধি রয়েছে। সমাধি লাগোয়া প্রাচীন মসজিদের গায়ে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। এতে নির্মাণকাল উল্লিখিত হয়েছে ৮৮৫ হিজরি অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দ।[১২৪] সুতরাং বোঝা যায় পনের শতকের শেষার্ধে ঢাকার আশেপাশে মুসলিম সমাজ বিস্তৃত হয়েছিল।

ইকলিম মুবারকাবাদের যে অংশটিকে আমরা ঢাকা নগর হিসাবে চিহ্নিত করেছি সে অঞ্চল থেকে পূর্বদিকে ১৪/১৫ কিলোমিটার দূরে সোনারগাঁও কেন্দ্র অবস্থিত। এখানে সুলতানি যুগের শুরু থেকেই মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতির তীর্থ-ভূমি গড়ে উঠেছিল। এ তথ্য ইতিহাসে এখন সুবিদিত। হানাফি আইনবিদ শয়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা তের শতকের শেষ দিকে সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন। এখানে তিনি একটি মাদ্রাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন। অনেক মুসলমান ছাত্র তাঁর মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করে। এছাড়া তাঁর খানকায় দুস্থ ও দরিদ্রের অন্ন সংস্থান হতো।[১২৫] এ প্রসঙ্গে পূর্বেও আলোকপাত করা

www.pathagar.com

হয়েছে। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে, সোনারগাঁওয়ের প্রতিবেশী অঞ্চলে এ জাতীয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সহজেই ঘটে থাকবে।

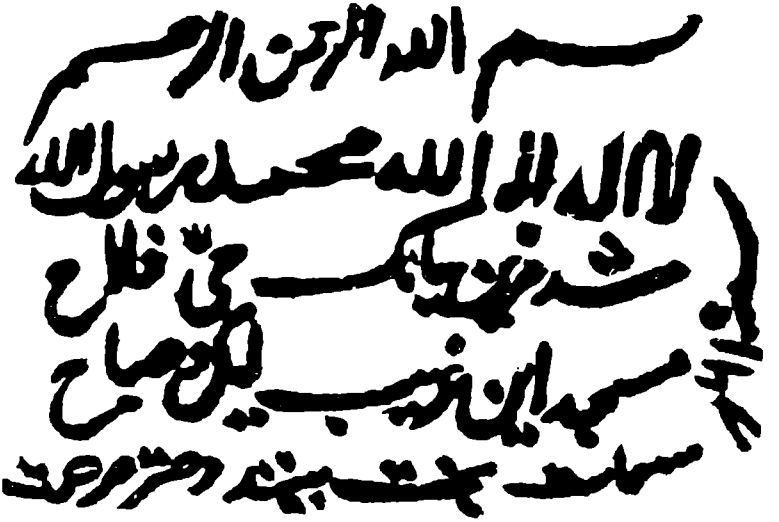

চিত্র-১০ : নারিন্দা শিলালিপি

সবশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। নারিন্দার মসজিদের শিলালিপিটিতে একটি বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তাতে বোঝা যায় উল্লিখিত মসজিদটির নির্মাতা মোসামৎ বখত বিনত নামের একজন মহিলা। ধর্ম ও শিক্ষার অনুপ্রেরণায় সমাজকর্মে এগিয়ে এসেছেন একজন মহিলা। সুলতানি যুগে এটি একেবারে অভিনব নয়। কারণ সামাজিক মর্যাদায় মেয়েদের অবস্থান ভালো ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মালদায় চালিশপাড়া অঞ্চলে একটি কবরের গায়ে প্রাপ্ত শিলালিপিতে জানা যায় নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহের সময় 'বোয়ামালতি' নামের এক মহিলা একটি কূয়ো খনন করেন। শিলালিপির উৎকীর্ণকাল ৯৩৮ হিজরি অর্থাৎ ১৫৩১-৩২ খ্রি.।[১২৬] পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রি.) গৌড়ের সাদুল্লাপুরে একটি মসজিদ নির্মাণের স্মারক শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। যার নির্মাতা ছিলেন 'বিবি মালতি' নামের এক মহিলা।[১২৭] সময় ও স্থান বিচারে মনে হয় এই দুই মালতি হয়তো অভিন্ন। এভাবে সমাজ-কর্মে ও ধর্মীয় প্রেরণায় দায়িত্ব পালন করতে মহিলাদের এগিয়ে আসা এ যুগে একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল।

মধ্যযুগের বাংলায় কয়েকটি মসজিদে কিছুটা সম্প্রসারিত স্থান লক্ষ করা গিয়েছে। গবেষকগণ এই স্থানগুলো মহিলাদের নামাজের স্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। গৌড়ের আদিনা মসজিদ, চাপাইনবাবগঞ্জের দরাসবাড়ী মসজিদ, নওগাঁওয়ের কুসুম্বা মসজিদ এবং রাজশাহীর বাঘা মসজিদ এ জাতীয় নামাজের স্থান থাকার চিহ্ন রয়েছে।[১২৮]

www.pathagar.com

মসজিদগুলোতে পাওয়া শিলালিপিতে সরাসরি মহিলাদের নামাজগৃহের কথা উল্লেখ না করা হলেও এর স্থাপত্যিক বিশেষত্ব এবং হাদিসে মহিলাদের মসজিদে বিশেষ ব্যবস্থায় নামাজ পড়ার স্বীকৃতি উপরের মতকেই নিশ্চিত করছে।[১২৯]

এই তথ্যসমূহ বর্তমান আলোচনায় যে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দেয় তা হচ্ছে সুলতানি শাসনযুগে অনেকটা উদার সামাজিক ধারণা নিয়ে মুসলিম সমাজ বিস্তৃত হয়েছিল। মধ্যযুগের সংস্কারাবদ্ধ ধ্যান-ধারণা উপেক্ষা করে সুলতানি যুগে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান অনেকটা উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। নারিন্দা মসজিদের নির্মাতা হিসাবে বখত বিনতের উপস্থিতি এরই স্বীকৃতি বহন করছে।

উপরের আলোচনায় কিছু সংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্ত ও ইতিহাসের যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া গিয়েছে যে, ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ কর্তৃক ঢাকায় মোগল রাজধানী স্থাপনের প্রায় দুশো বছর আগেও বর্তমান ঢাকা শহরের একটি অংশে নগর গড়ে উঠেছিল এবং মুসলিম সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক লক্ষণসমূহ নিয়ে সমাজ কাঠামো বিস্তৃত হয়েছিল।

স্বল্প আলোচিত প্রত্নস্থল বারবাজার

সুলতানি বাংলায় এক গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বাগেরহাট। পনের শতকের মাঝপর্বে সেনাপতি খান জাহান আলী বা খান-ই-জাহান এখানে মুসলিম বসতি স্থাপন করেন। তাঁর প্রশাসনিক অঞ্চলের নাম হয় খলিফাতাবাদ। খান-ই-জাহানের সময়ই খলিফাতাবাদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদ নির্মিত হয়। এই সেনাপতি পরে আধ্যাত্মিক সাধক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বাগেরহাটও ক্রমে মধ্যযুগের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে ইতিহাসে জায়গা করে নেয়। কিন্তু একইভাবে মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল হিসাবে ইতিহাসে ও সাধারণ্যে সুপরিচিত হওয়ার কথা ছিল বৃহত্তর যশোরের বারবাজার। বাগেরহাটে আসার আগে খান-ই-জাহান এখানেই প্রথম তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। বারবাজারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। সরকারি কর্তৃপক্ষ এর কয়েকটি সংরক্ষণও করেছে। এরপরও বাংলাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক অঞ্চল প্রায় অনালোচিত থেকে যাওয়ার প্রধান কারণ এই অঞ্চলের গুরুত্ব নিয়ে তেমনভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা না হওয়া। সম্প্রতি প্রত্নঅঞ্চল বারবাজার নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।[১৩০] ফলে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে তৈরি হয়েছে নতুন সম্ভাবনা।

বারবাজার অঞ্চলে বিশ শতকের শেষ দশকে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয় ব্যাপক প্রত্নক্ষেত্র এবং সুলতানি যুগের বিভিন্ন ধরনের প্রত্ননিদর্শন। বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খুলনার আঞ্চলিক কার্যালয় নব্বই-এর দশকের প্রথম থেকে এই অঞ্চলে উৎখনন কার্যক্রম শুরু করেছিল। বারবাজার বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান। কালিগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত এই প্রত্নস্থলটি মুসলিম-পূর্ব যুগ ও মুসলিম যুগের ইতিহাস বুকে ধারণ করে রয়েছে। এই অঞ্চলের আনুমানিক বিশ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জুড়ে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কালের করাল গ্রাসে সেগুলোর সিংহভাগই পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

www.pathagar.com

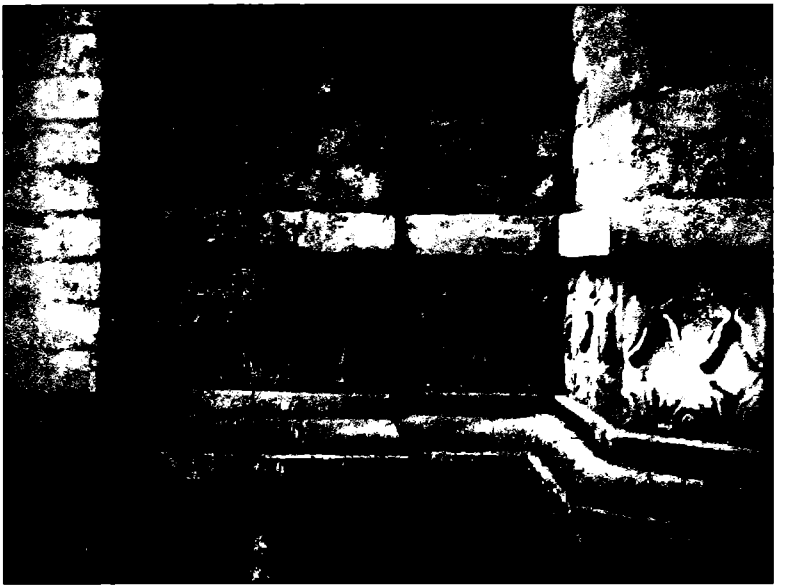

চিত্র-১১ : বারবাজার : সংস্কারের পর জোড় বাংলা মসজিদের একাংশ

প্রাচীনকালের প্রমত্তা বুড়ি ভৈরব বা ভৈরব নদের তীরে এক সুবিশাল এলাকাব্যাপী প্রাচীন এই জনপদটির উত্থান ঘটেছিল। মধ্যযুগে এই জনপদটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিশেষ করে পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ে বাংলার এই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসনাধীনে আসে।[১৩১] ও'মলী-এর বর্ণনা অনুযায়ী যশোর জেলা পনের শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসনাধীনে আসে।[১৩২]

এই অঞ্চলে তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠার জন্য মাহমুদাবাদ (বারবাজার) এবং খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট) নামক দুইটি প্রশাসনিক শহর গড়ে তোলেন।[১৩৩] এই মাহমুদাবাদ পরবর্তী সুলতানি আমল এবং মুঘল আমল পর্যন্ত মুসলিম বাংলার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে মাহমুদাবাদ থেকে মুদ্রা উৎকীর্ণ হতো। বারবাজার অঞ্চলে দুটি জাহাজঘাটার সন্ধান পাওয়ায় ধারণা করা যায় যে, এই অঞ্চল বড় ধরনের একটি ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবেও গড়ে উঠেছিল। অতএব বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বাংলার অন্যান্য এলাকার মতো মাহমুদাবাদ তথা বারবাজার এলাকায় স্বাভাবিকভাবেই স্থাপত্য ইমারত গড়ে ওঠে; কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই কালের বিবর্তনে সে সমস্ত স্থাপত্য নিদর্শনাদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রতিটি এলাকাতে দেখা যায় পুরাতন ইটের ছড়াছড়ি, প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষের স্মৃতিচিহ্ন। সময়ের আঘাতে সে স্থাপনাসমূহের অনেকগুলোই মাটির সঙ্গে একেবারেই মিশে গিয়েছে; আবার কোনো কোনোটি পরিণত হয়েছে বর্তমানকালের জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। এই সমস্ত

www.pathagar.com

জনবসতিতে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই তাদের ঘর তৈরিতে ধ্বংসাবশেষের পুরাতন ইট ব্যবহার করেছে। ফলে বারবাজার অঞ্চলের অনেক স্থাপত্য নিদর্শনই আর অবশিষ্ট নেই। তারপরও স্থাপনাসমূহের ধ্বংসস্তূপ তথা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি এবং এগুলো সম্পর্কিত স্থানীয় জনশ্রুতি তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে জানা ও গবেষণার জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সমস্ত তথ্য ও তৎকালীন সময়ের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের জন্য বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বারবাজার অঞ্চলে উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এতে প্রায় ১১টি স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থাপত্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে অধিকাংশই মসজিদ বলে

চিত্র-১২ : বারবাজার সাতগাছিয়া আদিনা মসজিদের বুরুজের একাংশ (সংস্কারের পর)

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করছেন। মসজিদ ছাড়াও এ সমস্ত প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত স্থাপত্য নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে কথিত জাহাজঘাটা, সেনানিবাস, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি। এইসব স্থাপত্য নিদর্শনাদির সঙ্গে লক্ষণাবতী, গৌড়, পাণ্ডুয়া, দেবকোট, খলিফাতাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে সুলতানি আমলে নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বারবাজারের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে উন্মোচিত এবং অমিত সম্ভাবনা নিয়ে এখনও যেসব নিদর্শন উন্মোচনের অপেক্ষায় মাটির নিচে অন্তরীণ রয়েছে সেসব নিদর্শনসমূহ হচ্ছে–জোড়বাংলা মসজিদ, নুনগোলা মসজিদ, পাঠাগার মসজিদ, শুকুর মল্লিক মসজিদ, সাদিকপুর মসজিদ (চেরাগদানি মসজিদ), গোড়ার মসজিদ, সিংদহ আওলিয়া মসজিদ, সাতগাছিয়া আদিনা জামে মসজিদ, মনোহর দিঘি মসজিদ, পীর পুকুর মসজিদ, গলাকাটা মসজিদ, জাহাজঘাটা, নামাজগাহ, দমদম ভিটা/সেনানিবাস, কোটালী

www.pathagar.com

মসজিদ, সওদাগর মসজিদ, শানাইদার মসজিদ, বাদশাহ শাহ সেকেন্দারের বাড়ি, হাসিলবাগ মসজিদ, শানবান্দার দরগাহ, কাজীর দরবার, মাতারাণীর দিঘি ও সমাধি, গাজী কালু ও চম্পাবতীর মাজার, ঘোপের ঢিবি, স্বরূপপুর মসজিদ ইত্যাদি।

প্রত্নস্থল বাগেরহাট : সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ

প্রত্ননিদর্শন প্রাপ্তির আলোকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বাগেরহাট। গুরুত্ব বিবেচনায় প্রত্নঅঞ্চল বাগেরহাট 'বিশ্ব ঐতিহ্যে'র অংশ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করছে পাহাড়পুর-ময়নামতি প্রত্নঅঞ্চল। এই দিক বিচারে বাগেরহাট প্রত্নস্থলের গুরুত্ব কিছুটা ভিন্ন। কারণ এই প্রত্নস্থল প্রধানত বাংলার মধ্যযুগের সুলতানি পর্বের প্রতিনিধিত্ব করছে। শ্চিম বাংলার গৌড়-পাণ্ডুয়া মধ্যযুগের স্বীকৃত প্রত্নঅঞ্চল। যদিও সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য ও প্রত্নবস্তু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তথাপি গৌড়-পাণ্ডুয়ার পরে বাগেরহাটই একমাত্র প্রত্নস্থল যেখানে সীমিত ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে সুলতানি পর্বের নির্দিষ্ট সময়কালের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধর্মীয় ইমারত ও প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়েছে এবং এখনও দু একটি সম্ভাবনাময় স্থান শনাক্ত করা গিয়েছে যেখানে উৎখননের মাধ্যমে প্রত্নসম্পদ উন্মোচনের অপেক্ষায় আছে।

বাগেরহাট প্রধানত পনের শতকের সাধক সেনাপতি খান-ই-জাহানের (সাধারণভাবে খান জাহান আলী নামে সুবিদিত) স্মৃতি বিজড়িত। পনের শতকের মাঝপর্বে এই মহান সেনাপতি সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের সময় খুলনা-যশোর অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে আগমন করেন। তিনি বারবাজার হয়ে বাগেরহাটে আসেন। তাঁর অবস্থান ও প্রশাসনের মুখ্য অঞ্চল হিসাবে বেছে নেন আজকের বাগেরহাটকে। মুদ্রা ও লিপি প্রমাণে সুলতানি যুগে খান-ই-জাহানের বিস্তৃত শাসন অঞ্চল তখন 'খলিফাতাবাদ' নামে পরিচিত। বাগেরহাট জেলায় *খলিফাতাবাদ* টাকশালের অবস্থান ছিল।[১৩৪] খান-ই-জাহান তাঁর প্রধান প্রশাসনিক অঞ্চল বাগেরহাটে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করেন এবং পুকুর ও দিঘি খনন করেন। তবে বাগেরহাটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মধ্যযুগের এ পর্ব থেকেই যে সূচিত হয়েছে তা বলা যাবে না। বৃহত্তর খুলনা-যশোর অঞ্চলে মানব বসতির প্রাচীন ধারা গবেষকগণ চিহ্নিত করতে পেরেছেন। প্রত্ননিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় যশোর-খুলনা অঞ্চলে প্রাচীনকালে সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত খুলনা ও বাগেরহাট ছিল যশোরের অন্তর্গত।[১৩৫]

ভারতের চব্বিশ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড় ও হরিনারায়ণপুর প্রত্নস্থল থেকে এ অঞ্চল খুব দূরে নয়। এসব অঞ্চলে মৌর্য ও পরবর্তী যুগের যেসব নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে 'ভরতভায়না' প্রত্নস্থলে পাওয়া বস্তুসংস্কৃতির মিল রয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনামলে (৩২৪-৩০০ খ্রি.পূ.) বাংলায় জৈনধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। তাঁর পৌত্র সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্মের প্রচারকরা বাংলায় আসেন। এ পর্যায়েই সমতটে—বিশেষত যশোর-খুলনায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে।[১৩৬] প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে বাগেরহাট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া না গেলেও সুন্দরবন অঞ্চল জুড়ে একটি রাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সেন যুগের ইদিলপুর তাম্রশাসন (আনু. ১০৯৭-১২২৩ খ্রি.)

www.pathagar.com

পাঠে জানা যায় সেন রাজত্বের অন্তর্গত ছিল সুন্দরবন। এ অঞ্চলের নির্দিষ্ট ভূভাগ তখন 'খাড়ি' নামে চিহ্নিত হতো।[১৩৭]

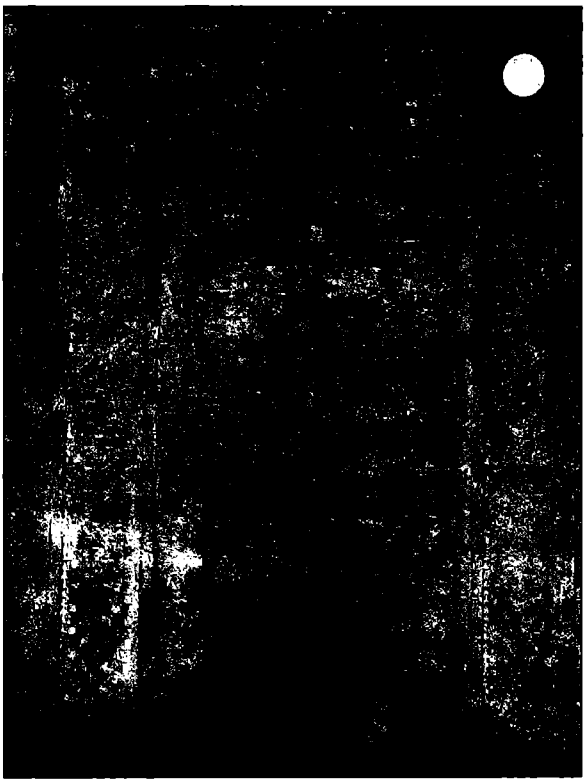

চিত্র-১৩ : নয় গম্বুজ মসজিদের মিহরাব

বাগেরহাটের প্রতিবেশী অঞ্চল গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় বিশাল মাটির দুর্গ উন্মোচিত হয়েছে। এর কাছাকাছি অঞ্চলে গুপ্তযুগের মুদ্রা (৪-৫ শতক) এবং আনুমানিক ৬ শতকে রাজত্বকারী রাজাদের ৫টি তাম্রফলক পাওয়া গিয়েছে। তাম্রফলকের বর্ণনা অনুযায়ী এই দুর্গের নাম 'চন্দ্রবর্মনকোট'। পণ্ডিতদের বিচারে পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মণ ৪ শতকে এই দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন। পুষ্করণকে শনাক্ত করা হয়েছে পশ্চিম বাংলার শুশুনিয়ার ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে বাঁকুরা জেলার পোখরনা গ্রামকে।[১৩৮] এই তথ্য নিশ্চিত করছে যে, চন্দ্রবর্মণ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একজন স্বাধীন শাসক ছিলেন এবং তাঁর সময়ে বাগেরহাটের কাছাকাছি অঞ্চলে সমৃদ্ধ মানব বসতি গড়ে উঠেছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কথা আগে বলা হয়েছে। ভরতভায়না প্রত্নস্থলে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন প্রাপ্তির কথা জানা যায়। ভবিষ্যৎ উৎখননে এ বিষয়ে আরো নিশ্চিত হওয়া যাবে। ভরতভায়না ও কোটালীপাড়ায় মানব বসতির যে প্রাচীন ধারার কথা

www.pathagar.com

প্রত্নসূত্রে জানা যায় তার ধারাবাহিকতায় বাগেরহাটে প্রাচীন জনবসতির বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। এর সমর্থনে বাগেরহাটে প্রাপ্ত প্রাচীনতম প্রত্ননিদর্শনের (আনু.১০-১১ শতক) কথা বলা যেতে পারে। এটি একটি বুদ্ধের অক্ষোভ্য মূর্তি। খান-ই-জাহানের মাজার সংলগ্ন ঠাকুরদিঘি (খাঞ্জেলী দিঘি) খননকালে এই মূর্তিটি পাওয়া যায় বলে লোক মুখে প্রচারিত।[১৩৯] মূর্তিটি এখন সংরক্ষিত আছে। এছাড়া বাগেরহাটে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে মানব বসতির দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বাগেরহাট শহর থেকে ৫-৬ মাইল দূরে পানিঘাট গ্রামে। এখানে একটি অষ্টদশভূজা দেবিমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। দেবিমূর্তিটি সম্ভবত সেন আমলের।[১৪০] একই গ্রামের নিকটবর্তী লাউপালা গ্রামের পার্শ্বস্থ মরা ভৈরবের প্রাচীন খাত থেকে পাওয়া গিয়েছে একটি চর্তুভূজা বাসুদেব মূর্তি। মূর্তিটি অত্যন্ত প্রাচীন বিধায় কালের আঘাতে অনেকটাই ক্ষয়ে গিয়েছে।[১৪১]

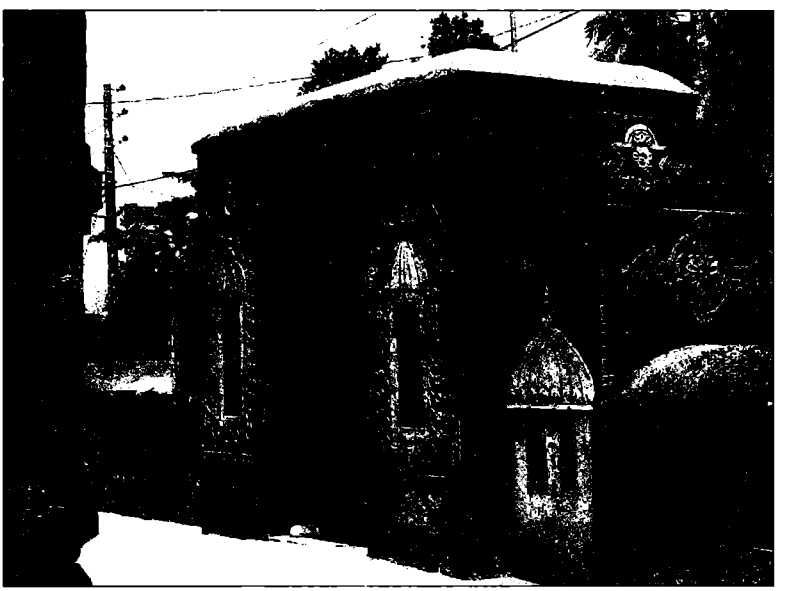

চিত্র-১৪: খান-ই-জাহানের সমাধি তোরণ : অদক্ষ সংস্কার

ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তরে মগরার খালের পাড়ে 'জাহাজঘাটা' প্রত্নস্থলে মাটিতে প্রথিত অবস্থায় একটি পাথরের স্তম্ভ পাওয়া গিয়েছে। মাটির ওপর প্রায় চার ফুট দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভটি। স্তম্ভের উপরের অংশে একটি অষ্টভুজা

www.pathagar.com

মহিষমর্দিনী মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। অনুমান করা যায় কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের সাক্ষ্য বহন করছে স্তম্ভটি।

উপরের বিশ্লেষণকে ধারণ করে আমরা বাগেরহাটে খান-ই-জাহানের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ স্থাপনা এবং পুকুর ও দিঘিসমূহের দিকে যদি তাকাই তবে এ বিষয়টি নিশ্চিত হবে যে, কোনো নির্জন বা পরিত্যক্ত ভূমিতে খান-ই-জাহান তাঁর প্রশাসন কেন্দ্র গড়ে তুলেননি। মধ্যযুগে–বিশেষ করে সুলতানি পর্বে নির্মাণ সামগ্রী অপ্রতুল ছিল। তাই মসজিদ নির্মাণকে দেওয়া হয়েছিল অগ্রাধিকার। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় মুসলিম সমাজের স্মারক ছিল মসজিদ। খান-ই-জাহান এবং তাঁর অনুগামীদের জন্য হলে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে এত বেশি সংখ্যক মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন হতো না। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা চলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এসময় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাছাড়া স্থানীয় মানুষদের কল্যাণ চিন্তায়ই বিপুল সংখ্যক পুকুর খনন করা হয়েছিল। খান-ই-জাহান শুধু একজন বিজয়ী সেনাপতিই ছিলেন না তিনি একজন সাধকও ছিলেন। সুলতানি বাংলার সুফি তৎপরতা ও জনজীবনে সুফি প্রভাব সম্পর্কিত ইতিহাস থেকে জানা যায় সুফিগণ জনকল্যাণমুখী কাজে নিজেদের যুক্ত রাখতেন।[১৪২] সমুদ্র সান্নিধ্য হওয়ায় বাগেরহাট অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট থাকা স্বাভাবিক। তাই খান-ই-জাহান সে যুগের সুফি ও প্রশাসকের দায়িত্ব বিবেচনাতেই নিজের সৈন্যসামন্ত ও অনুগামী ছাড়াও স্থানীয় মানুষের কল্যাণ সাধনে প্রচুর জলাধার খনন করান।

অতএব সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় এক বিশেষ কালপর্বে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয় ধারণ করে আছে বাগেরহাট প্রত্নঅঞ্চল। বাগেরহাট প্রত্নঅঞ্চলকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বাগেরহাটের ঐতিহ্যিক গুরুত্ব উন্নীত হয়েছে জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। বিশ্ব জুড়ে সকল সভ্য দেশই তাদের অতীত-ঐতিহ্য যত্ন ও মমতার সঙ্গে সংরক্ষণ করে। সংরক্ষণ করে নিজেদেরই এগিয়ে নেওয়ার জন্য—আলোকিত করার জন্য। ঐতিহ্যিক প্রণোদনা বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করে, ভবিষ্যৎ নির্মাণ প্রচেষ্টাকে দেয় সহযোগিতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাগেরহাটের প্রত্ননিদর্শনসমূহ বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। বাগেরহাটে সংরক্ষিত স্থাপনার মধ্যে মসজিদ এবং সমাধিই প্রধান। এসব নিদর্শন থেকে মুসলিম-পূর্ব যুগ সম্পর্কে খুব বেশি ধারণা নেওয়া সম্ভব নয়। মধ্যযুগের প্রথম পর্ব অর্থাৎ স্বাধীন সুলতানি যুগের আঞ্চলিক ইতিহাস নির্মাণই শুধু নয় বরঞ্চ বাগেরহাট অঞ্চলের স্থাপত্যসমূহ তার শৈলী বিচারে সুলতানি যুগপর্বেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। ফলে বর্তমান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক গৌরবের আকর সূত্র হিসাবে বাগেরহাট অনেক বেশি ঐশ্বর্য নিয়ে উপস্থাপিত হতে পারে।

স্থাপত্যকলার বিবেচনায় খান-ই-জাহানের সময়ে গড়া ইমারতসমূহের বিশেষত্ব রয়েছে। এর মূল ধারণায় দিল্লির তুঘলক স্থাপত্যের প্রভাব থাকলেও সম্পূর্ণ নির্মাণ শৈলীতে একটি স্বতন্ত্র রীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যে কারণে অধ্যাপক দানী শৈলী বিবেচনায় বাগেরহাটের মধ্যযুগের ইমারতসমূহকে 'খানজাহানী রীতি' বলে উলেখ করেছেন।[১৪৩] বাংলার সুলতানি ইমারতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেমন এখানে পাওয়া যায়

www.pathagar.com

পাশাপাশি একটি নিজস্ব ঘরানারও বিকাশ ঘটতেও দেখা যায়। এ কারণে বাগেরহাটের স্থাপত্য মূল্যায়ন করতে গেলে সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় উপস্থাপন করতে হয়। এ যুগের ইমারত সাধারণত ইটে তৈরি। দেওয়াল গড়া হয় দেড় থেকে চার মিটার পর্যন্ত পুরু করে। স্তম্ভ বা দেওয়ালের প্লিন্থে কখনো কখনো পাথর বসানো হয়ে থাকে। কখনো কখনো ভেতরের খিলান বসানো হয় পাথরের স্তম্ভের ওপর। বহির্দেওয়ালের চারকোণে থাকে চারটি বুরুজ। এগুলোর বেশিরভাগই অষ্টভুজাকৃতির হয়ে থাকে। বুরুজগুলো ছাদের সমান্তরালে গিয়ে শেষ হয়। এক বুরুজ থেকে অন্য বুরুজ পর্যন্ত টানা ছাদ ধনুকের মতো বাঁকা। গম্বুজগুলো একেবারেই স্থানীয় অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। অনেকটা উল্টানো পাত্রের মতো এবং নিরাভরণ। গম্বুজের বেশিরভাগই ত্রিকোণী পেন্ডেন্টিভের উপর এবং কখনো কখনো স্কুইঞ্চের উপর বসানো। ষাট গম্বুজের মতো বড় বড় ইমারতের অভ্যন্তরভাগে দ্বিকেন্দ্রিক সূচাগ্র খিলান বহনের জন্য পাথরের স্তম্ভ সারিবদ্ধভাবে বসানো হয়েছে। এর ফলে ভেতরটা খোলামেলা রাখা সম্ভব হয়। ইমারতের ভেতরে ও বাইরে আলংকারিক বন্ধনী ও পোড়ামাটির অলংকরণ থাকে। মসজিদগুলোতে পূর্বদিকের প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিমে সমসংখ্যক মিহরাব থাকে। খিলানাকৃতির মিহরাবে আয়তাকার ফ্রেম করে তা কারুকার্যমণ্ডিত করা হয়।[১৪৪]

এসব রীতির অনেকটাই ধারণ করেছে বাগেরহাটের ইমারতসমূহ। আবার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও যুক্ত হয়েছে। যেমন খানজাহানি রীতির কর্নার টাওয়ার বা কোণের বুরুজ অষ্টভূজাকৃতি না হয়ে হয় গোলাকৃতি। অনুমান করা যায়, কুঁড়েঘরে বাঁশের খুঁটি ব্যবহারের ধারণার মিশ্রণ আছে এই গোলাকার বুরুজ ব্যবহারে। বাঁশের খুঁটিতে যেমন কিছু পর পর গাঁট থাকে এসব বুরুজেও সমান বিরতিতে রয়েছে ব্যান্ড। চৌচালা আকৃতির গম্বুজও বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদে দেখা যায়। বিস্তারিতভাবে না হলেও সীমিতভাবে পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায় এ অঞ্চলের প্রত্ন-ইমারতে। অলংকরণে শিকলঘণ্টা, জাফরি, গোলাপ, পদ্ম ইত্যাদি সাধারণ মোটিভের পাশাপাশি স্থানীয় উদ্ভিদের উপস্থাপনও বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। কোথাও দেখা গিয়েছে মেঝেতে রঙিন মোজাইকের ব্যবহার।

বাগেরহাট প্রত্নঅঞ্চলে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর অন্যতম হচ্ছে—ষাটগম্বুজ মসজিদ, সিঙ্গাইর মসজিদ, খান-ই-জাহানের সমাধি, মাজার সংলগ্ন মসজিদ, ঠাকুর দিঘি বা খাঞ্জেলী দিঘির ঘাট, নয় গম্বুজ মসজিদ, চুনাখোলা মসজিদ, বিবি বেগনী মসজিদ, ফকিরবাড়ি মসজিদ বা রণবিজয়পুর মসজিদ, খান-ই-জাহানের বসতবাটি, রণবিজয়পুর চিল্লখানা, জাহাজঘাটা অথবা পাথরঘাটা, জিন্দাপীরের ইমারত গুচ্ছ, রেজাখোদা মসজিদ ইত্যাদি।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। যেহেতু প্রত্ননিদর্শন ইতিহাস পুনর্গঠনে সহায়তা করে ফলে ঐতিহ্য অনুসন্ধানের প্রয়োজনেই প্রত্নঅঞ্চল, স্থাপনা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন যথাযথ সংরক্ষণ করা জরুরি। কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট সংকট রয়েছে। আইন ও পদ্ধতি মেনে সংস্কার সংরক্ষণ না হওয়ায় ঐতিহ্য অনুসন্ধানের আকর সূত্র প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে। এর উদাহরণ হিসাবে বাগেরহাটের স্বরূপ উন্মোচন করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

চিত্র-১৫: সংস্কারের আগে ষাটগম্বুজ মসজিদের অভ্যন্তর

বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ রক্ষা ও তদারকির মুখ্য দায়িত্ব সরকারের। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ওপর এ ক্ষেত্রটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। অধিদপ্তর ১৯৩৮ সালে প্রণীত Archaeological Works Code অনুসারে কর্ম-সম্পাদনে দায়বদ্ধ। এই কোডে প্রাচীন ইমারত সংস্কার-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে ধারাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো, "All archaeological works including those involving restoration or the preservation of new feartures not integral but incidental to the preservation of ancient monuments"-এর পাশাপাশি আরো স্পষ্ট করা হয়েছে ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি আইনে। ১৪নং ধারার ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংরক্ষিত কোনো পুরাকীর্তির কোনো প্রকার পরিবর্তন (Alter) বা বিকৃতি (Deface) শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শুধু বাংলাদেশই নয় বিশ্বের সকল সভ্য দেশই তাদের ঐতিহ্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে—আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপস্থাপনের জন্য নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন

www.pathagar.com

করে প্রত্ননিদর্শন অবিকৃত রেখে সংরক্ষণের চেষ্টা করে এবং পুরাকীর্তি আইন কঠোরভাবে মান্য করে।

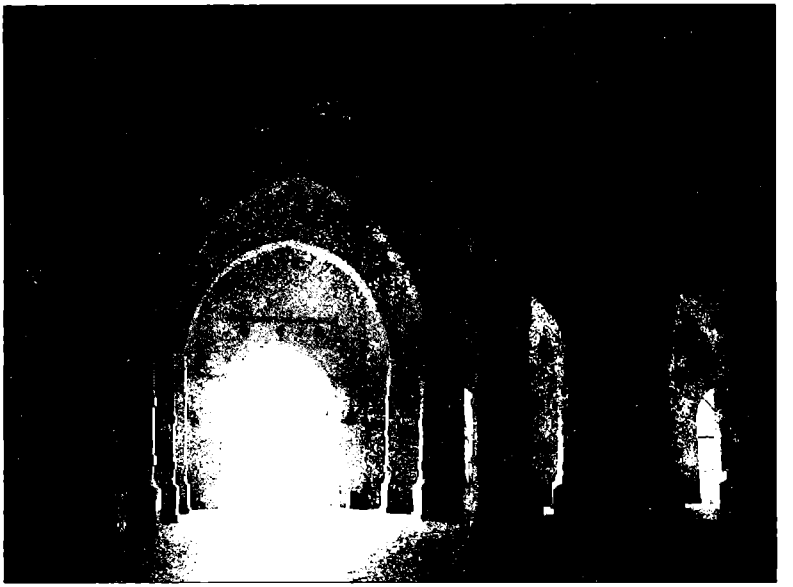

চিত্র-১৬: সংস্কারের পর ষাট গম্বুজ মসজিদের অভ্যন্তর

কিন্তু আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দেওয়ায় এবং পুরাকীর্তি আইন মান্য না করায় যে ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে তার একটি চিত্র উল্লেখ করা হলো :

ক. ষাটগম্বুজ ও রণবিজয়পুর মসজিদের অভ্যন্তরভাগ মোটা পস্টারে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ষাটগম্বুজ মসজিদের অন্যতম স্থাপত্যিক অহংকার পাথরের স্তম্ভগুলো পস্টারের আড়ালে অন্তরীণ থাকায় এদের আর পাথর হিসাবে শনাক্ত করার উপায় নেই। এটি সরাসরি পুরাকীর্তি আইনের লঙ্ঘন। এই ভুল সংস্কারকর্ম ইতিহাসকেও বিকৃত করেছে। সুলতানি ও মোগল যুগ শিল্পশৈলীর বিচারে মধ্যযুগের দুটো স্বতন্ত্র পর্ব।

স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে এই দু যুগের শৈলীতে বড় দাগে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ইমারতে পস্টারের ব্যবহার করা না করা। পস্টারের ব্যবহার মোগল যুগের আগে তেমন দৃশ্যমান ছিল না। এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টি অধ্যাপক দানীর ভাষায় প্রামাণ্য করা যায়। তিনি বলেছেন, "...Lime has also been used as a plaster, especially on the parapet, roof and dome in order to make building water-tight. In the Mughal period plaster was widely used on the surface of the walls as well."[১৪৫] অতএব সরাসরি বলা যায় ষাটগম্বুজ ও রণবিজয়পুর মসজিদের অভ্যন্তর দেওয়াল, স্তম্ভ পস্টারে আবৃত ও চুনকামে উজ্জ্বল করে সুলতানি ইমারতের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করা হয়েছে। স্তম্ভসমূহ পস্টারে অন্তরীণ হওয়ায় সাধারণ দর্শক

www.pathagar.com

যেমন ঐতিহ্যিক সৌন্দর্য দর্শনে বঞ্চিত হচ্ছেন তেমনি ভবিষ্যৎ গবেষকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিরও অবকাশ তৈরি হয়েছে। পাথর সহজলভ্য না হওয়ায় বাংলার মধ্যযুগের সৌধ প্রধানত ইটে নির্মিত। সীমিতভাবে কোথাও কোথাও পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। মালদহ জেলার রাজমহলের পাহাড় থেকে আনা হতো কালো ব্যসল্ট পাথর। খুব কম বেলেপাথর ও গ্রানাইট পাথরের ব্যবহার দেখা যায়, যা আমদানি করা হতো বিহার থেকে। এসব আমদানির সঙ্গে খান-ই-জাহানের সময় বাগেরহাট যে যুক্ত ছিল সে ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হতে পারে ষাটগম্বুজ মসজিদের পাথুরে স্তম্ভ এবং জাহাজঘাটা প্রত্নস্থল। কিন্তু ভবিষ্যৎ গবেষক পাথর খুঁজে না পেয়ে ইতিহাসের সূত্র হারিয়ে ফেলতে পারেন বলে আমাদের আশংকা।

ষাটগম্বুজ মসজিদের পূর্বদিকের মূল প্রবেশ দরজার খিলানের ওপরে এবং ছাদের নিচে ত্রিকোণাকার পেডিমেন্ট ছিল। কিন্তু সংস্কারের সময় কোনোরূপ নিয়ম না মেনে তা নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে। এটি নিছক সংস্কারের নিয়ম ভঙ্গই নয়, নষ্ট করা হয়েছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। সুলতানি যুগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সুলতান ও সুফিদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে একটি সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছিল। তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় স্থাপত্যিক শৈলী এবং অলংকরণে। উল্লিখিত পেডিমেন্টের ব্যবহার বাংলাদেশের সুলতানি ইমারতে সহজলভ্য নয়। গ্রিক ঐতিহ্যে এর খোঁজ পাওয়া যায় বেশি। তাছাড়া পেডিমেন্টের নীচে একটি পোড়ামাটির অলংকরণ এখনও অক্ষত। অনেকটা হিন্দু মোটিভের সঙ্গে মেলানো যায়। এটি প্রতিমার পেছনে জ্যোতির্বলয় এবং সর্প-ফণা সদৃশ্য। মসজিদের পোড়ামাটির অলংকরণগুলো রক্ষা পেলে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বিষয় আরো স্পষ্ট করা সম্ভব হতো।

ষাটগম্বুজ মসজিদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পর্কেও প্রশ্নের অবকাশ আছে। ইউএনডিপি ১৯৮৩ সালে 'Master plan for the conservation and preservation of the ruins for the Buddhist Vihara at Paharpur and the historic Mosque-city of Bagerhat' শিরোনামে বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি কর্মপ্রস্তাব পেশ করেছিল। এখানে ষাটগম্বুজ মসজিদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রস্তাব ছিল। ইউনেস্কো তাদের কাজের একটি আগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশ করে ১৯৯১ সালে। সেখানে দেখা যায় সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য প্রস্তাবিত কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে খননকার্য পরিচালনা করে একটি সীমানা প্রাচীরের ভিত্তিও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, খনন রিপোর্ট প্রকাশের আগে যে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে তার সঙ্গে কতটা যুক্ত করা হয়েছে ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে? সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা নির্ধারিত হওয়ার ভিত্তি কি? দেওয়ালের শীর্ষের জন্য যে বিশেষ আকৃতির ইট ব্যবহার করা হয়েছে, স্থাপত্যের ভাষায় যাকে বলা হয় Coping Brick তা এই সুলতানি স্থাপত্যের পাশে কোন বিবেচনায় জায়গা করে নিল? মসজিদ স্থাপত্যের একমাত্র ব্যতিক্রম ষাটগম্বুজ মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালে একটি দরজা ছিল। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এটি ইট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

খ. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত প্রত্নস্থল হওয়ার পরও কীভাবে খান-ই-জাহানের মাজারের বহির্দেওয়াল ও ফটকে উৎকট রংয়ের ব্যবহার সম্ভব হলো, মাজারসংলগ্ন মসজিদের আদি রূপে নানা ধরনের বিকৃতি সাধন করা হলো, ঠাকুর দিঘির ঘাটের সিঁড়ি

www.pathagar.com

আধুনিকায়ন করা সম্ভব হলো তা এক বিস্ময়। এসব ক্ষতি সুলতানি যুগের স্বাভাবিক ধারণাকে বিভ্রান্ত করবে।

বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মধ্যযুগ বিশেষ করে সুলতানি পর্ব নানা দিক থেকে সোনাফলা। হিন্দু-বৌদ্ধ অধ্যুষিত এদেশে তের শতকের শুরুতে রাজশক্তি হিসাবে বহিরাগত মুসলমানরা প্রবেশ করে। এর আগে সীমিত অঞ্চলে সুফি-সাধকগণ মুসলিম সমাজ বিকাশের পটভূমি রচনা করেছিলেন। সুলতানি শাসনপর্বে সাড়ম্বরে মুসলিম সমাজ-বিকাশ চলতে থাকে। এ পর্বেই শহর খলিফাতারাদের পত্তন হয়। যার কেন্দ্র আজকের বাগেরহাট। ফলে দীর্ঘকাল ধরে লালিত ঐতিহ্যের ধারক বাগেরহাটের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা রক্ষার মধ্যদিয়েই ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনর্নির্মাণের সম্ভাবনা স্পষ্ট হবে।

বাঘা মসজিদ-মাদ্রাসা কমপ্লেক্স: সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

রাজশাহী শহর থেকে ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বাঘার অবস্থান। *আইন-ই-আকবরী*তে বাঘাকে 'সরকার বারবকাবাদে'র অংশ বলা হয়েছে। অধুনালুপ্ত লস্করপুর পরগণার অংশ ছিল আজকের বাঘা। বর্তমান গবেষণায় বাঘার প্রত্নঅঞ্চলটিকে একটি কমপ্লেক্স হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে রয়েছে সুলতানি ও মোগল যুগের কয়েকটি স্থাপনা। এর মধ্যে সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের নির্মিত জামি মসজিদ, সুলতানি ও মোগল যুগের সন্ধিক্ষণে অবস্থানকারী সাধক মওলানা শাহ দৌলা ও তাঁর পাঁচ স্বজনের সমাধি, বাঘা মাদ্রাসার ভীত, দিঘি, সমাধি সংলগ্ন মসজিদ, ছোট আকারের মোগল মসজিদ এবং প্রাচীন কবরখানা।

চিত্র-১৭: জীর্ণদশা মোগল মসজিদের একাংশ

www.pathagar.com

রাজশাহী-বাঘা সড়ক থেকে উত্তরে মসজিদ-মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে প্রবেশ করলে পাওয়া যাবে বিশাল এক খোলা চত্বর। এই চত্বরের মাঝামাঝি রয়েছে দেয়াল-ঘেরা সমাধি। সমাধিটিকে ছায়া করে দাঁড়িয়ে আছে একটি বটবৃক্ষ। সমাধিটির ঐতিহাসিকতা নিশ্চিত নয়। উন্মুক্ত চত্বর শেষে উত্তরে জামি মসজিদের দক্ষিণ প্রবেশদ্বার। বাঘা জামি মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ইমারত। চমৎকার টেরাকোটা অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। শিলালিপিতে উৎকীর্ণ তারিখ ৯৩০ হিজরি (১৫২৩-২৪ খ্রি.)।[১৪৬]

ক. বাঘা মসজিদ

পোড়ামাটির অপূর্ব অলঙ্করণে সজ্জিত আয়তাকার এই মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৭৫-৮´´ এবং প্রস্থ ৪২-২´´। চার কোণে রয়েছে চারটি অষ্টকোণী টাওয়ার বা বুরুজ। বুরুজের উপরে রয়েছে ছত্রী। মসজিদের ছাদ ধনুক বক্র-আকৃতির। এতে রয়েছে দশটি অর্ধ-গোলাকৃত গম্বুজ। মসজিদের অভ্যন্তরে রয়েছে পাথরের স্তম্ভ। বাঘা মসজিদের প্রবেশ পথে অর্থাৎ পূর্বদিকে পাঁচটি খিলানযুক্ত দরজা রয়েছে। কিবলায় বা পশ্চিমে রয়েছে পাঁচটি মিহরাব। উত্তর-পশ্চিম কোণে আংশিক দ্বিতল অংশ রয়েছে। অনুমান করা হয় এটি মহিলাদের নামাজ-ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হতো। (বাঘা মসজিদ বহুল আলোচিত[১৪৭] বিধায় বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না)।

চিত্র-১৮: মওলানা শাহদৌলার সমাধি

খ. সমাধি এলাকা, মসজিদ ও দিঘি

মসজিদ এলাকার উত্তরের ফটক পেরুলে আরেকটি খোলা চত্বর রয়েছে। এই চত্বরের উত্তর সীমানায় পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত দেয়াল ঘেরা আয়তাকার সমাধি ক্ষেত্র আছে।

www.pathagar.com

এখানে প্রধান সমাধিটি মাওলানা শাহ দৌলার। এ ছাড়া রয়েছে আরো পাঁচটি সমাধি। বলা হয়ে থাকে মাওলানা শাহ দৌলার নিকটাত্মীয়রা শায়িত আছেন এখানে। সমাধি এলাকা থেকে কিছুটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আগে একটি ছোট মসজিদ ছিল। বর্তমানে এটিকে একটি বড় আকারের আধুনিক মসজিদে রূপান্তর করা হয়েছে। মসজিদটির পেছনে পূর্বদিকে রয়েছে এক বিশাল দিঘি। দিঘিটি উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত। বাঘা মসজিদ কমপ্লেক্স এলাকাটি আশেপাশের বসতিগুলোর চেয়ে অনেকটা উঁচু। ধারণা করা যায় এই দিঘি খননের মাটিতেই এলাকাটি ভরাট করা হয়েছিল।

গ. মাদ্রাসা

প্রবন্ধকার কর্তৃক পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাঘা মাদ্রাসার সীমানা চিহ্নিতকরণ। অনুসন্ধানে বাঘা মসজিদ ও মাওলানা শাহ দৌলার সমাধি ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী এলাকাতে মাদ্রাসার ভীত পাওয়া গিয়েছে। মাদ্রাসাটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত ছিল।

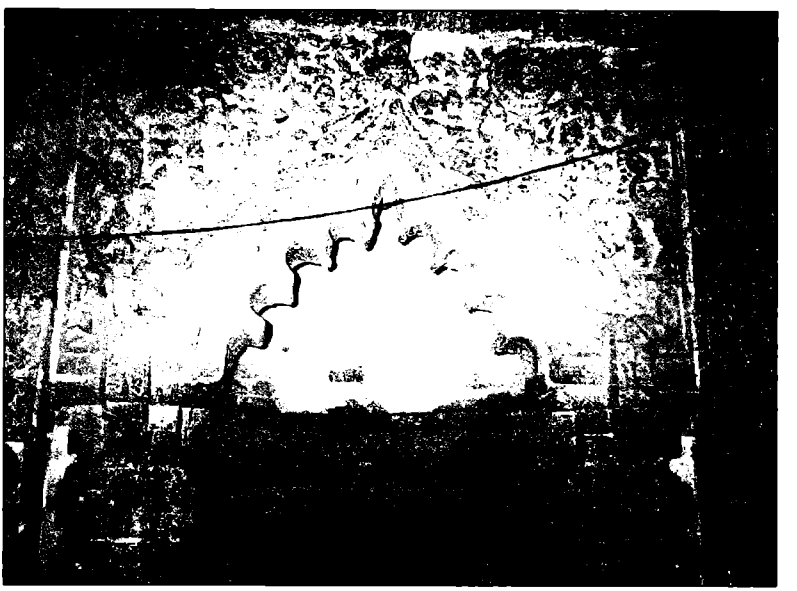

চিত্র-১৯: বাঘা মসজিদের মিহরাব অলঙ্করণ

বাঘা মাদ্রাসা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। মাওলানা শাহ মুয়াজ্জম দানিশমন্দ ওরফে শাহ দৌলা নুসরত শাহের শাসনকালে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঘায় আসেন। জনশ্রুতি মতে তিনি বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদের বংশধর ছিলেন। বাঘায় এসে তিনি বাঘার নিকটবর্তী মখদুমপুর নিবাসী অন্যতম প্রভাবশালী অভিজাত আলা বখশ বরখুরদার লস্করীর কন্যাকে বিয়ে করেন।[১৪৮] এখানে খানকাহ স্থাপন করে চূড়ান্তভাবে বসতি স্থাপন করেন তিনি। প্রথম দিকেই তিনি

www.pathagar.com

মাদ্রাসা স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে বাঘা শাহী মসজিদটি নির্মিত হয়। প্রথম পর্যায়ে মাদ্রাসাটির স্থাপনা কেমন ছিল বা এর আকার কতটুকু ছিল তা জানা যায় না। তবে শাহ মুহম্মদ দানিশমন্দের ছেলে হযরত হামিদ দানিশমন্দ ওরফে হাওদা মিয়ার সময়ে মাদ্রাসাটির একটি কাঠামোর কথা জানা যায়। ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল লতিফ (বাংলার দিউয়ান আবুল হাসানের অধীনস্ত কর্মকর্তা) বাঘা পরিদর্শন করে মাদ্রাসাটির একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এতে জানা যায় ছনের ছাউনি-দেওয়া মাটির ঘরে মাদ্রাসাটির পাঠদান চলছিল। আবদুল লতিফ এ সময় ১০০ বছরের বৃদ্ধ হাওদা মিয়াকে দেখেছিলেন।[১৪৯] প্রচলিত জনশ্রুতি মতে সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ মাদ্রাসাটি পরিচালনার জন্য অনুদান দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাহ দৌলা সে দান গ্রহণ করেননি। পরে পুত্র হামিদ দানিশমন্দ সুলতানের দান গ্রহণ করেন।

হামিদ দানিশমন্দের পর বাঘা মাদ্রাসাটির দায়িত্ব চলে আসে পুত্র মওলানা হযরত শাহ আবদুল ওয়াহাবের নিকট। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মোগল সম্রাটের পক্ষে শাহজাদা খুররমের কাছ থেকে রাজকীয় ফরমান লাভ করেন। তাতে সুফি পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৪টি গ্রাম দান করা হয়। ১৮৩৫ সালের এডাম রিপোর্টের সূত্র অনুযায়ী এর আয় থেকে মাদ্রাসার ব্যয়ভার বহন করা হতো।[১৫০] এই সূত্র ধরে সহজ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে গড়ে ওঠা বাঘা মাদ্রাসা এক শতক ধরে টিকেছিল। এরপর কি বাঘা মাদ্রাসা তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে? এ ব্যাপারে ইতিহাসের সূত্র যখন প্রায় নীরব তখন নতুন আলো পাওয়া যায় উইলিয়াম এডামের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে। রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বাঘাতে ফারসি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই তথ্য বাঘা মাদ্রাসার ধারাবাহিকতার কথাই যেন মনে করিয়ে দেয়। ধারাবাহিকতার এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করলে মানতে হয় মাদ্রাসাটির স্থিতিকাল শাহ দৌলার সময়কাল থেকে শুরু করে পরবর্তী তিন শতাধিক বৎসর।

সাম্প্রতিক অনুসন্ধান: মাদ্রাসার সীমা চিহ্নিতকরণ

সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে মাদ্রাসাটির ইটের তৈরি ভীত শনাক্ত করা গিয়েছে। তাছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ঢিবি। ঢিবি খুড়লেই বেরিয়ে আসে প্রাচীন ইট। এই সূত্রে প্রাথমিকভাবে মাদ্রসাটির সীমা চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়েছে। মাদ্রাসাটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৪ আর উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থ ১৩০। এখানে প্রাপ্ত ইটের আকার দৈর্ঘ্যে ৯″, প্রস্থে ৮″ এবং পুরুত্বে ৩″। আগেই বলা হয়েছে মাদ্রাসাটি প্রথম পর্যায়ে মাটির ঘর ছিল। তাই প্রাপ্ত ইটের ভীত ও ইটের আকৃতি বিচারে অনুমান করা যায় মোগল যুগের পূর্বে পাকা ইমারত তৈরি হয়নি। সম্ভবত মাদ্রাসার জন্য লাখেরাজ ভূমি পাওয়ার পর পাকা ইমারত বা অন্তত পাকা ভীতে ঘর গড়া হয়েছিল। মাদ্রসার চিহ্নিত এলাকার ভেতর এখনও অনেক ঢিবি রয়েছে। তার ভেতর অন্তরীণ আছে অসংখ্য ইট ও খোলামকুচি।

মোগল স্থাপনার অন্যান্য নিদর্শন

বাঘা মসজিদ-মাদ্রাসা কমপ্লেক্সের পশ্চিম-উত্তর কোণে এবং শাহ দৌলার সমাধির সোজা পশ্চিমে একটি ছোট আকারের মোগল মসজিদ এখনও রয়েছে। জায়গায় জায়গায়

www.pathagar.com

স্থানীয় উদ্যোগে সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদের প্রধান দরজার উপরে সাঁটা রয়েছে একটি শিলালিপি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর এমিরেটাস ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী শিলালিপিটি পাঠ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধকারও পাঠ করে অভিন্ন সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মসজিদ নির্মাণের তারিখ ১২২০ হিজরি অর্থাৎ ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দ। নির্মাতা হিসাবে উৎকীর্ণ নামটি হচ্ছে জালাল উদ্দিন জাফর শাহ আলম বিন আলমগীর।

মসজিদটির দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে ২৯´ এবং প্রস্থ উত্তর-দক্ষিণে ২৬´। ১৮´ প্রশস্ত একটি ফ্যাসাদ রয়েছে। মসজিদে মূল প্রবেশ পথ একটি। এটি উচ্চতায় ৭´ এবং চওড়ায় ৩´-১০´´। খিলানাকৃতির এই প্রবেশ পথটি ছাড়াও ডানে ও বাঁয়ে আরও দুটি খিলানাকৃতির প্রবেশ পথ রয়েছে। এগুলো উচ্চতায় ৬´-৮´´ এবং চওড়ায় ৩´। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণের পার্শ্ব দেওয়ালে দুটো খিলানাকৃতির গবাক্ষ রয়েছে। মিহরাবটি উচ্চতায় ৫´-১১´´ এবং চওড়ায় ২´-১০´´। এই মোগল মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। কেন্দ্রীয় গম্বুজে মোগল শিল্প প্রকরণ স্পষ্ট। একটি ড্রামের ওপর গম্বুজটি উত্থিত। গায়ে রয়েছে পদ্ম পাঁপড়ি। অবশ্য এগুলো অনেকটারই ভগ্নদশা। কেন্দ্রীয় গম্বুজের দুই পার্শ্বের গম্বুজ দুটি চতুষ্কোণাকার। এগুলোতেও পদ্ম-পাঁপড়ি রয়েছে। মসজিদের চারকোণে রয়েছে চারটি বুরুজ বা কর্নার টাওয়ার। মসজিদের ভেতরে দুই সারিতে নামাজ পড়ার মতো পরিসর রয়েছে। প্রতি সারিতে ২০-২২ জন মুসল্লি দাঁড়াতে পারে।

কবরখানা

মোগল মসজিদটির গা-ঘেঁষে-উত্তরে একটি প্রাচীন কবরস্থান রয়েছে। মোগল রীতিতে গড়া দুটি ভগ্ন-প্রায় পাকা কবর এখনও দৃশ্যমান। বাকিগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত। মসজিদ ও কবরখানার পশ্চিমে একটি ছোট ডোবা রয়েছে। ডোবার পশ্চিম পাড়ে রয়েছে এক অনুচ্চ ঢিবি। ঢিবির ওপরে একই রীতির আরেকটি পাকা কবর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। আশেপাশে রয়েছে প্রচুর ইটের টুকরো। মসজিদের উত্তরে কবরখানার পর একটি পায়ে-চলা পথ চলে গিয়েছে পশ্চিমে। এই পথের উত্তরে দেওয়াল-ঘেরা একটি পাকা সমাধি রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের বক্তব্যে এটি 'জহরে পীরের মাজার'। এর সপক্ষে লিপিতাত্ত্বিক কোনো প্রমাণ নেই। আমাদের অনুমান মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, খাদেম এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ শায়িত আছেন এই কবরখানায়। অনুমানের পেছনে যুক্তিগুলো হচ্ছে : ক. তিন শতাধিক বছরের মাদ্রাসা পরিচালনায় নিয়োজিতদের জন্য কাছাকাছি কবরখানা থাকা স্বাভাবিক, খ. যেহেতু মোগল-পূর্ব যুগে এখানে ইটের ব্যবহার ছিল না ; তাই শুধু মোগল যুগের কবরগুলোই দৃশ্যমান, গ. এ সময়ে ইট সহজলভ্য ছিল না এবং স্বাভাবিকভাবেই কবর বাঁধানো ব্যয় সাপেক্ষ ছিল। ফলে আম-জনতার কবর পাকা হওয়ার কথা নয়। এ কারণেই যেহেতু কবরগুলো মাদ্রাসা ও মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত; তাই এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের হওয়াই স্বাভাবিক।

বাঘা মসজিদ-মাদ্রাসা কমপ্লেক্সের অবস্থান মধ্যযুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষ করে তিন শতাধিক বৎসর স্থায়ী বাঘা মাদ্রাসা উত্তর বাংলায় শিক্ষার স্থিতিশীল কাঠামো বিকাশের

www.pathagar.com

তথ্যকেই যেন নিশ্চিত করে। বর্তমান প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে বাঘা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্র যেটুকু উন্মোচিত হয়েছে তা ভবিষ্যৎ গবেষণাকে কিছুটা উৎসাহিত করতে পারে।

শরিয়তপুরে প্রত্নস্থল শনাক্ত ও বিশ্লেষণ: সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নতুন সংযোজন

শরিয়তপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার দক্ষিণে ধানুকা গ্রাম। এখানেই মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল তার ইতিহাসকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রত্নস্থলটি সাধারণ্যে ময়ূরভট্টের বাড়ি বা মনসাবাড়ি নামে পরিচিত। এই দুই নাম ঘিরে তৈরি হয়েছে দুটো কিংবদন্তি। একই বাড়ির সীমানার ভেতরে পাঁচটি ইমারত রয়েছে'। এর কোনো কোনোটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংসপ্রায়। আবার কোনো কোনোটি কালের আঘাত সহ্য করে এখনও অনেকটা সদম্ভে দাঁড়ানো। স্থানীয় জনশ্রুতি ও নির্মাণশৈলী দেখে সাধারণভাবে সিদ্ধান্তে আসা যায় ইমারতগুলোর একটি দুর্গামন্দির, একটি মনসামন্দির, একটি কালীমন্দির, একটি নহবতখানা ও একটি আবাসিক গৃহ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ইমারতগুলোর নির্মাণশৈলী বা ব্যবহৃত নির্মাণ-উপকরণ থেকে সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয় এগুলো সুলতানি বা মোগল যুগে তৈরি। এই ধারণার সঙ্গে কিংবদন্তিসমূহেরও একটি যোগসূত্র রয়েছে। তাতে মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অগ্রস্থিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস দৃশ্যপটে উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনারই ইঙ্গিত যেন স্পষ্ট হচ্ছে।

বর্তমান শরিয়তপুর জেলার সদর থানা পালং। এই থানা সদরের দক্ষিণে ধানুকা গ্রামের অবস্থান। প্রাচীনকালে অঞ্চলটি বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল জেমস্ রেনেল কর্তৃক অংকিত বিক্রমপুরের মানচিত্রে এই সত্য স্পষ্ট।[১৫১] ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর ঢাকা কালেক্টরি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে[১৫২] তখন থেকেই পালং থানা ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ধানুকা গ্রামের প্রাচীনত্বের কথা যেমন বিভিন্ন জনশ্রুতিতে ছড়িয়ে আছে, তেমনি এই গ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। স্থান-নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে জনশ্রুতি তৈরি হয়েছে– তাতে বলা হয় ধানুকা নামটি হয়েছে 'ধানকুয়া' শব্দ থেকে। তাৎপর্য হচ্ছে কুয়া (কূপ) সদৃশ খণ্ড খণ্ড নিচু জমিতে পর্যাপ্ত ধান জন্মাত বলে স্থানটি ধানকুয়া > ধানুকা নামে পরিচিত।

এখনো এ অঞ্চলে অসংখ্য প্রাচীন পুকুর ও দীঘি দেখা যায়। বলা হয়ে থাকে এই গ্রামে প্রায় এক হাজার পুকুর রয়েছে। পুকুরের এই অবস্থিতিকে ধানকুয়া নামকরণের যে কারণের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিতগণ ধানুকার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা অনুধাবন করেছিলেন। এই ইতিহাস খুঁজে বের করার একটি আকুতি ছিল তাঁদের। '...দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধানুকা গ্রামে মৃত্তিকা-গর্ভে পুরাতন দালানের ভগ্নাবশেষ এবং অন্যান্য অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। উহার ঐতিহাসিক বিবরণ কেহ প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।[১৫৩] কিন্তু কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান না হওয়ায় সাধারণভাবে কেউ কেউ ধারণার বশবর্তী হয়ে একটি সমাধানে পৌঁছতে চেয়েছেন। যেমন প্রফুল্লচন্দ্র মহাশয়ের আকুতির একটি সহজ উত্তর দিতে চেয়েছেন নগেন্দ্র ভট্টশালী। তিনি লেখেন '...চাঁদ রায় কেদার রায়ের সময় দক্ষিণ বিক্রমপুর নানা

www.pathagar.com

বিষয়ে কিরূপ উন্নত ছিল তা ঐতিহাসিকদিগের নিকট অজ্ঞাত নহে। স্থাপত্য শিল্পে ও ব্যবসায় বাণিজ্যে তখনকার সময়কে বিক্রমপুরের গৌরবময় যুগ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অভিহিত করিয়াছেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রভৃতির কীর্তির কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দক্ষিণ বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে মৃত্তিকা গর্ভে সুপ্তাবস্থায় আছে। ধানুকার মাটির নীচে দালান প্রভৃতি তাঁদের সময়কার বলিয়াই মনে হয়।'[১৫৪] ধানুকার গুরুত্ব সংক্রান্ত আরও কিছু সূত্র রয়েছে যা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা যাবে। তবে গুরুত্বের বিচারে এ সমস্ত ছিটে-ফোঁটা ইঙ্গিত এবং বর্তমানে মনসাবাড়ি বলে পরিচিত বাড়িতে দৃশ্যমান সুদৃশ্য প্রাচীন ইমারতসমূহ ও গ্রামটির চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রত্নবস্তু গবেষকদের মনে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলের সৃষ্টি করবে। ইমারতগুলোর ইট-সুরকি আর অলংকরণের ভেতর যে সমস্ত না বলা কথা লুকিয়ে আছে তাকে বাঙ্ময় করার দায়িত্ব উপলব্ধ হবে। এই দায়িত্ববোধ ও কৌতূহল থেকে ধানুকার মনসাবাড়ির উপর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলাম প্রায় এক দশক আগে।

প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থে বা প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে মনসাবাড়ি সম্পর্কে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। ইমারতসমূহের অবস্থান ও গঠনশৈলী একটি না-বলা ইতিহাসের সম্ভাবনা শুধু প্রকাশ করছে। তাই বর্তমান গবেষণার জন্য আমাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হয়েছে।

ক. কিংবদন্তি : মনসাবাড়ি ঘিরে কয়েকটি কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে। আমাদের প্রাথমিক কৌতূহল সৃষ্টিতে এই কিংবদন্তিগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। কিংবদন্তিতে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে ইতিহাসের ইঙ্গিত। তাই আমাদের অনুসন্ধান কার্যক্রমে কিংবদন্তি গুলোকে সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি।

খ. ঐতিহাসিক সূত্র : মনসাবাড়ি নিয়ে ইতঃপূর্বে সুনির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থ বা দলিল লিখিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তথাপি আমরা মনসাবাড়ি-সংশ্লিষ্ট লিখিত দলিলপত্রকে পরোক্ষ সূত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছি। হস্তলিখিত কতিপয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আমরা খুঁজে পেয়েছি, যার মধ্যে দিয়ে মনসাবাড়ি নামের প্রত্নস্থলে যাদের মূল বাসস্থান ছিল এবং এই ইমারতরাজি যাদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত তাঁদের বংশলতা তৈরি সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত তথ্যাবলিকে আমরা গ্রহণ করেছি ইতিহাসের যোগসূত্র তৈরির প্রয়োজনে। তাছাড়াও আমরা পাণ্ডুলিপি আকারে কিছু প্রবন্ধ উদ্ধার করেছি যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস পুনর্গঠনে একটি অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

গ. প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি : যত্ন সহকারে কাঠের বাঁধাইয়ে সংরক্ষিত বেশ কিছু সংখ্যক প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি শরিয়তপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। এর অধিকাংশই তুলট কাগজে লিখিত। সামান্য কিছু পাওয়া গিয়েছে তালপাতায় লেখা। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়েছে এই পুঁথিগুলো এক সময় মনসাবাড়ি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল। এই ধারণা আমাদের সংশ্লিষ্ট ইতিহাস নির্মাণে সাহায্য করেছে।

ঘ. স্থাপত্যসমূহের অবস্থান ও নির্মাণশৈলী : মনসাবাড়িকে ঘিরে যে সমস্ত স্থাপত্য গড়ে উঠেছে তাঁর নির্মাণশৈলীতে চমৎকারিত্ব ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তাছাড়া স্থাপনাসমূহের অবস্থানগত দিকেরও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের পথ ধরে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

www.pathagar.com

গৃহীত সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা দুটো ভিন্ন আঙ্গিকে ইতিহাস নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছি। প্রথমত আমরা দৃষ্টি দিয়েছি মনসাবাড়ি প্রত্নস্থল কোনো সময়ে ও কী বিশেষ বিষয় ধারণ করে গড়ে উঠেছিল– সেদিকে। দ্বিতীয়ত আমাদের লক্ষ্য ছিল সময়কালীন ইতিহাসের ধারার সঙ্গে এই প্রত্নস্থলের কী ধরনের সম্পর্ক তা লক্ষ করা। বাংলার ইতিহাসের কোন দিকটি সমৃদ্ধ করেছে এই প্রত্নস্থলটির সমকালীন কার্যভূমিকা। অর্থাৎ এই প্রত্নস্থলটির গুরুত্ব বিচার। এই উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবায়নের জন্য আমরা পূর্বে উল্লিখিত সূত্র ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছি।

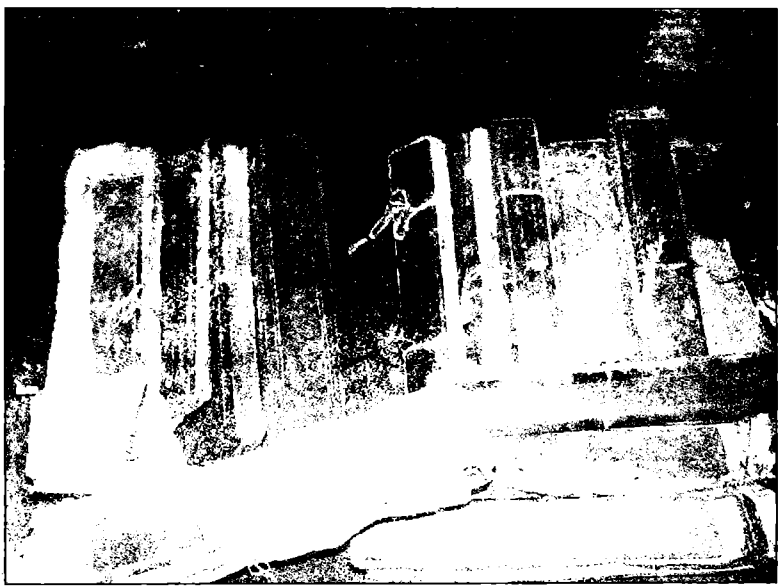

চিত্র-২০: শরীয়তপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত মনসাবাড়ি টোলের পুঁথি

স্থাপত্যসমূহের সাধারণ পরিচিতি

গবেষক বা কৌতূহলী মানুষের মনসাবাড়ির প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে এর স্থাপনাসমূহ দেখে। সদর রাস্তা থেকে উত্তর-দক্ষিণে ধানুকা গ্রামে চলে যাওয়া কাঁচা রাস্তা দিয়ে আনুমানিক এক কিলোমিটার এগুলে পশ্চিম দিকে মনসাবাড়ির অবস্থান। রাস্তা থেকে বাড়িটির দূরত্ব আনুমানিক পাঁচশত গজ। বাড়িটির প্রবেশমুখে একটি বড় পুকুর রয়েছে। পুকুরের পশ্চিম পাড় থেকে শুরু হয়েছে মূল বাড়ির সীমানা, একটি বড় আঙ্গিনার তিনদিকে তিনটি ইমারত স্থাপত্যিক নির্মাণের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। মনসাবাড়িকে দুটো অঞ্চলে ভাগ করা যায়। আলোচ্য বর্তমান অংশটি প্রথম অঞ্চল। একে আমরা মন্দিরবাড়ি নামকরণ করতে পারি। মন্দিরবাড়ির পশ্চিম সীমার মাঝামাঝি পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলো প্যাটার্নের দোচালা ছাদবিশিষ্ট ইমারত। এটি একসময় মনসামন্দির হিসাবে ব্যবহৃত হতো। উত্তরের প্রান্তসীমায় দক্ষিণদিকে মুখ করে অপেক্ষাকৃত বড় একটি ইমারত রয়েছে। এটিও দোচালা

www.pathagar.com

ছাদবিশিষ্ট। ইমারতটি দুর্গামন্দির বলে চিহ্নিত। মন্দিরবাড়ির দক্ষিণ সীমায় দুর্গামন্দিরের দিকে মুখ করে একটু ভিন্ন ডিজাইনের একটি ইমারত রয়েছে। এটি ছিল দ্বিতল ইমারত। দ্বিতীয় তলাটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এটি নহবতখানা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। মন্দিরবাড়ির এই সাজানো চত্বরের ধার ঘেঁষে একটু বাইরে রয়েছে কালীমন্দির। কালীমন্দিরটি একটি দ্বিতল ইমারত। দোতলার অনেকটা এবং একতলার একটি অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

মন্দিরবাড়ির দক্ষিণে নহবতখানার পেছন থেকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত ধ্বংসপ্রায় বিশাল ইমারত রয়েছে। বহুকক্ষবিশিষ্ট এই ইমারতটি দ্বিতল ছিল। বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিমের একাংশে দ্বিতলের কাঠামোটি টিকে আছে। মনসাবাড়ির এই অঞ্চলটিকে শিক্ষায়তন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষায়তনের সঙ্গেই হয়ত আচার্যদের বসতবাটি ছিল। বর্তমানে তা পৃথকভাবে চিহ্নিত করার উপায় নেই।

মনসাবাড়ির স্থাপত্যিক নিদর্শন প্রাথমিকভাবে গবেষককে কৌতূহলী করে তুলবে। এই কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাবে বাড়িটিকে ঘিরে গড়ে-ওঠা দুটো কিংবদন্তি শুনে। ময়ূরভট্টের কিংবদন্তি সময়ের বিচারে বেশি প্রাচীন। মনসাবাড়ি প্রথম দিকে ময়ূরভট্টের বাড়ি হিসাবে পরিচিত ছিল। আমাদের ধারণা, বর্তমান বাড়িটির দ্বিতীয় অঞ্চল অর্থাৎ টোল বা শিক্ষায়তন ছিল প্রথম পর্যায়ের স্থাপনা। মন্দিরসমূহ গড়ার আগে এ অঞ্চলটি হয়ত ময়ূরভট্টের বাড়ি বলেই পরিচিত ছিল। কিংবদন্তিটি বোধকরি সেভাবেই গড়ে উঠেছে। কিংবদন্তি অনুযায়ী ভারতের কনৌজ থেকে একসময় ভট্টাচার্য পরিবার শরিয়তপুরের ধানুকা অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। এঁদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন ময়ূরভট্ট। ময়ূরভট্ট যখন মাতৃগর্ভে তখন একবার তাঁর মা-বাবা তীর্থ করার জন্য কাশিধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক বনের ভেতর ভট্টাচার্যের স্ত্রী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তীর্থের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়েছেন ভট্টাচার্য পরিবার। ধর্মের চেয়ে সন্তানের মায়াকে বড় করে দেখলেন না তাঁরা। নবজাতককে একটি শালপাতায় ঢেকে রেখে তীর্থের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। তীর্থ শেষ হলে ভট্টাচার্য পরিবারকে স্বপ্নে দেখা দিলেন দেবতা। জানালেন তাঁদের পূজা গ্রহণ করেননি তিনি। সদ্যোজাত পুত্রকে বনে অরক্ষিত রেখে আসা তাঁদের অন্যায় হয়েছে। নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন ভট্টাচার্য দম্পতি। ফিরে এলেন সেই বনে। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখতে পান একটি ময়ূর পাখা দিয়ে ঢেকে রেখেছে তাঁদের পুত্রকে। মায়ের কোলে ফিরে আসে পুত্র। ময়ূরের আশ্রয়ে বেঁচেছিল বলে ছেলের নাম রাখা হয় ময়ূরভট্ট। আর এই ময়ূরভট্টের উত্তরসূরিরা ভট্টাচার্য বাড়ির নাম দিয়েছেন ময়ূরভট্টের বাড়ি। ভট্টাচার্যের আগমনের সূত্র অনুসন্ধানে এই কিংবদন্তি ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে মনসাবাড়ির বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে গড়ে-ওঠা শিক্ষায়তনের স্থাপত্য একটি ঐতিহাসিক পটভূমি গড়ে তোলার পথ সৃষ্টি করেছে। মন্দিরবাড়ির স্থাপত্যসমূহ সেদিক থেকে কিছুটা নবীন। এই স্থাপনাসমূহের প্রাচীন সূত্র ধারণ করে দ্বিতীয় কিংবদন্তিটি গড়ে উঠেছে। ময়ূরভট্ট বাড়ির এক কিশোরের অভ্যাস ছিল প্রত্যুষে বাগানে ফুল কুড়ানো। এক প্রত্যুষে ফুল কুড়াতে গিয়ে দেখতে পায় বাগানে মস্তবড় এক সাপ। ভয় পেয়ে কিশোর ছুটে আসে বাড়িতে। পরদিন ফুল কুড়াতে গিয়ে আবার সাপের মুখোমুখি হয়। সাপ ভয়ার্ত কিশোরের পিছু বাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করে ও কিশোরকে ঘিরে নত্য করতে থাকে। বাড়ির লোকজন

www.pathagar.com

ভয়ে-বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করতে থাকে এই দৃশ্য। রাতে স্বপ্নে তাদের কাছে আবির্ভূতা হন দেবী মনসা। তিনি মনসা পূজা করার নির্দেশ দেন। এর পরেই আচার্য বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় মনসামন্দির। সেই থেকে এই বাড়ির নাম হয় মনসাবাড়ি।

আপাতদৃষ্টিতে মনসাবাড়িতে যে স্থাপত্যসমূহ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে তাতে এই অঞ্চল ও অবস্থানের একটি সমৃদ্ধ অতীতের সম্ভাবনার কথাই স্পষ্ট হয়েছে। আমরা মনসাবাড়ির যে অঞ্চলকে টোল বা শিক্ষায়তন বলে চিহ্নিত করেছি তার স্থাপত্যিক নিদর্শন এর বিরাটত্বকে নির্দেশ করছে এবং নিশ্চিত করছে, সমসাময়িককালে এ অঞ্চলে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল।

টোলের মূল ইমারতটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। দক্ষিণমুখ করে তৈরি বলে বাড়ির প্রথম অংশ অর্থাৎ মন্দির বাড়ি পেছনে করে দাঁড়ানো। তবে নির্মাণশৈলী এমন যে পেছনের দিক থেকেও কক্ষে প্রবেশ করার জন্য খিলানাকৃতির বেশ কটি দরজা রয়েছে। মধ্যযুগে বহুল-ব্যবহৃত পাতলা ইটের সঙ্গে চুন-সুরকির গাঁথুনি ও পলেস্তরায় ইমারতটি নির্মিত হয়েছে। চুনের সঙ্গে অথবা চুনের বিকল্পে ঝিনুক চূর্ণও ব্যবহৃত হয়েছে বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়। ইমারতটির নির্মাণশৈলীতে মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব স্পষ্ট। যেহেতু মনসাবাড়ির কোনো ইমারতেই লিপি পাওয়া যায়নি ; তাই সরাসরি কাল নির্ণয়ে সমস্যা রয়েছে। ফলে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য সূত্র থেকে সময় সম্পর্কে একটি ধারণা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গটি নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

টোলের ইমারতটি পূর্ব-পশ্চিমে ৫৭ ফুট লম্বা। সাধারণ পর্যবেক্ষণে ধারণা করা যায়, পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটানা ৩৮ ফুট ইমারত তৈরি করার পর বিরতি দেওয়া হয়েছিল। পরে পশ্চিমে আরও ১৯ ফুট সম্প্রসারণ করে ইমারতে পূর্ণতা আনা হয়। ইমারতটি প্রস্থে ৩২ ফুট। তবে দৃশ্যমান অংশ ছাড়া আরও ১৫ ফুট ভিত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। এখানে একসময় সম্প্রসারিত প্রকোষ্ঠ থেকে থাকলে প্রস্থের মাপ হবে ৪৭ ফুট। ইমারতটির পুরোটাই একসময় হয়ত দ্বিতল ছিল। পূর্বদিকে ছাদ ধ্বসে গিয়েছে, তাই দ্বিতলের অস্তিত্ব নেই। তবে পশ্চিমাংশে দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠ এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী ইমারতটিতে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ রয়েছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ছাড়া এর সত্যতা নির্ণয় সম্ভব নয়। স্থানীয় জনসাধারণের বক্তব্য অনুযায়ী পশ্চিমের একাংশে কোনো এক কৌতূহলী সরকারি কর্মকর্তার (মহকুমা প্রশাসক) নির্দেশে অদক্ষ হাতে খনন করার চেষ্টা নেয়া হয়েছিল। পরে সে উদ্যোগ পরিত্যক্ত হয়। তবে সামান্য খননের পরে মাটির বেশ গভীরে ইটের আস্তরণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাতে করে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জনশ্রুতি অনুযায়ী সেখানে একটি পুকুর (চৌবাচ্চা) ছিল। ইমারতটির সম্মুখভাগ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। ভেতরের প্রকোষ্ঠের দেয়াল মসৃণ পলেস্তরা করা। একটা হালকা সবুজ রঙ এখনও স্পষ্ট। দেয়ালে তেমন অলংকরণ নেই, তবে হালকা খাঁজকাটা সরল ডিজাইন রয়েছে। দেয়ালে দুই-তিন ফুট পরপর রয়েছে খিলানাকৃতির কুলুঙ্গি।

ইমারতটি কিছুটা দেবে গিয়েছে। সাপের ভয়ে ইমারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হয়নি অনেকদিন। দিনে দিনে দুর্গম হয়ে উঠেছে। তাই এখানে বর্তমানে কয়টি কক্ষ অবশিষ্ট রয়েছে তা নির্ণয় করার উদ্যোগ নেয়া যায়নি। তবে শিক্ষায়তন হিসাবে এর বিরাটত্ব কৌতূহল উদ্রেক করে। ইমারতের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একে আবাসিক

www.pathagar.com

শিক্ষায়তন বলেও ধারণা করা যেতে পারে। একটি সমৃদ্ধ টোল হিসাবে মনসাবাড়ির এই ইমারতটিকে নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করার স্বপক্ষে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক যুক্তি আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি।

একটি প্রশ্ন সর্বপ্রথম আমাদের মনে হয়েছে, পূর্ব বাংলার একটি আটপৌরে বাঙালি অঞ্চলে এমন একটি সংস্কৃত টোল গড়ে উঠেছিল কিভাবে? এই প্রশ্নের নিষ্পত্তিতে আমাদের সামনে দুটো বিষয় প্রথম আলো প্রক্ষেপণ করে। প্রথমত আমরা পূর্বেই প্রবাসী প্রত্রিকার দুটো উদ্ধৃতির উল্লেখ করে ধানুকা অঞ্চলের সমৃদ্ধির আভাস পেয়েছি। বাঙলার বিভিন্ন সমৃদ্ধ অঞ্চলেই এ জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র গড়ে ওঠার প্রবণতা রয়েছে। তাই ধানুকায় এরূপ একটি সমৃদ্ধ টোল গড়ে ওঠা অসম্ভব কিছু নয়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কবি জয়ন্তী বা বৈজয়ন্তীকে আবিষ্কার।[১৫৫] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবি বৈজয়ন্তীকে সতের শতকের মধ্যভাগের একজন সংস্কৃত কবি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে বৈজয়ন্তীর জন্ম ধানুকায়। তিনি পিতা 'মুরভট্টে'র নিকট থেকে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন এবং মীমাংসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অবশ্য কবি জয়ন্তীর মূল্যায়ন বা জীবনচরিত নিয়ে অন্য কোনো গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কোনো কোনো প্রাচীন গ্রন্থে শুধু কিছুমাত্র আভাস রয়েছে। শরিয়তপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কবি ও রবীন্দ্র-গবেষক প্রয়াত রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী ষাটের দশকে সংবাদপত্রে কবি জয়ন্তীর জীবন ও কবিকৃতি নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[১৫৬] শ্রী চৌধুরীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে আমরা পেয়ে যাই ১৯৫৭ সালে শ্রী হরিহর ভট্টাচার্য লিখিত পাণ্ডুলিপি। কবি জয়ন্তী দেবি শিরোনামে লিখিত এই প্রবন্ধে কবি সম্পর্কে মূল্যবান কিছু সূত্র পাওয়া যায়। শ্রী ভট্টাচার্য দাবি করেন, তাঁর মাতামহ বংশে জয়ন্তী দেবীর বিয়ে হয়েছিল। ফরিদপুরের কোটালী পাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত পরিবারে জন্ম হয়েছিল জয়ন্তীর স্বামীর। তাঁর স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম একজন প্রতিথযশা সংস্কৃত কবি ছিলেন। তাঁর লিখিত *আনন্দললিতা* নামে একটি চম্পুকাব্য রয়েছে। এই কাব্যের শেষে কৃষ্ণনাথ গ্রন্থ প্রণয়নে সহকারিণী হিসাবে পত্নীর নাম উল্লেখ করেছেন। এতে শুধু জয়ন্তীর নাম-ই পাওয়া যায়নি সেই সঙ্গে একটি তারিখও পাওয়া যায়। শ্লোকটি নিম্নরূপ :

> শাকে বেদমুনীষু চন্দ্রগণিতে (১৫৭৪) পক্ষে বলক্ষে মধৌ
> শ্রীমদ্ বন্দোপদার বিন্দ যুগলং শ্রী তর্কবাগীশ্বরম্।
> নত্বা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ বটুনা কাব্যংময়া কল্পিতং
> সাহিত্যাদি কলা কলাপ কুশল স্ব স্ত্রী-জয়ন্ত্যা...॥

এই শ্লোকটি শ্রী ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকে স্পষ্টতই রচনাকালে ১৫৭৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জয়ন্তী দেবি এই সময়কালের বিবেচনা করে মনসাবাড়ির সংস্কৃত টোলের কর্মময় সময় হিসাবে তারিখটিকে গ্রহণ করা যায়। এই সূত্র অবলম্বন করেই টোলটির উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টা নেয়া যেতে পারে।

পূর্বে উল্লেখিত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কোনো সূত্র উল্লেখ ছাড়াই বৈজয়ন্তীর পিতার নাম মুরভট্ট বলা হয়েছে। এভাবে জয়ন্তী অনেকের নিকট মুরভট্ট বা ময়ূরভট্টের কন্যা হিসাবে পরিচিত। আমরা বর্তমান গবেষণার শুরুতেই ময়ূরভট্টের বাড়ি সংক্রান্ত কিংবদন্তির অবতারণা করেছি। সাহিত্যের ইতিহাসে দুজন ময়ূরভট্টের কথা

www.pathagar.com

জানা যায়। একজন সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাসদ ছিলেন। যিনি সাত শতকে 'সূর্যশতক' গ্রন্থ লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। অন্যজন চৌদ্দ শতকের কবি। ধানুকার আচার্যদের বংশলতা আলোচনা কালে তাঁকে খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ শতকের শেষ ভাগের লোক বলে মনে হবে। গবেষণা কালে আমরা মনসাবাড়ির ভট্টাচার্য পরিবারের একটি বংশলতার সন্ধান পেয়েছি (পরে দ্রষ্টব্য)। পাণ্ডুলিপি আকারে তৈরি এই বংশলতায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের অনেককেই আমরা এই সময়সীমায় শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত বিশ্বকোষে (১ম খণ্ড)[১৫৭] অন্তর্ভুক্ত হতে দেখেছি। ফলে বংশলতায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে মেনে নেয়ায় তেমন সংকট নেই।

বংশলতাটি অনেক যত্নে তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি আমাদের দেখার সুযোগ হয় শরিয়তপুরে পূর্বোল্লিখিত রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর বাড়ি রথীন্দ্র-ভবনের লাইব্রেরিতে। বেশ বড় আকৃতির শক্ত বাঁধাই খাতাতে বংশলতা তৈরি করা হয়েছিল। সংকলক নিজের নাম লিখেছেন শ্রীনিবারণ চন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ। ঠিকানা দিয়েছেন ধানুকা, পো: পালং, ফরিদপুর। সংকলনের তারিখ ১৩১৭ বাংলা, ১ কার্তিক। পাণ্ডুলিপির প্রতি পাতায় একটি ডিম্বাকৃতির রাবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে বাংলায় সংকলকের নাম ঠিকানা ছাড়াও ইংরেজিতে MAHIM CHANDRA VATTACHARYA ESTATE কথাটি লিখিত হয়েছে। এতে অনুমিত হয়, ব্রিটিশ যুগের শেষ অধ্যায়েও ধানুকার মনসাবাড়ি শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান ছিল। কারণ মনসাবাড়িটি ভট্টাচার্যদেরই গড়া আর পেশার দিক থেকে ভট্টাচার্যরা অধ্যাপনা করতেন। তাঁদের নামে একটি এস্টেটের স্বীকৃতি আমাদের এই অনুমানকেই সমর্থন করে।

সংকলনে বিস্তৃত বংশলতার উল্লেখ রয়েছে। একদিকে যেমন মনসাবাড়ি-সংশ্লিষ্ট পুরুষদের ক্রম অনুসারে সজ্জিত করা হয়েছে। অন্যদিকে এই বাড়ির কন্যাদের বৈবাহিক সূত্রে সৃষ্ট ভিন্ন শাখার বংশ-তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। আমরা মনসাবাড়ি ঘনিষ্ট বংশীয়দের তালিকাটি এখানে উল্লেখ করছি। এই বংশলতার সর্বশেষ পুরুষ শ্যামাপদ চক্রবর্তী মনসাবাড়ির একাংশে বাস করছেন এবং মন্দিরগুলো দেখাশুনা করছেন।[১৫৮] শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষ-১-এর উনবিংশ ভাগে পূর্ববঙ্গে কনৌজ থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। শরিয়তপুরের মনসাবাড়ির প্রায় পাঁচ একর জায়গা জুড়ে (বর্তমানে তার অধিকাংশই বেদখল হয়ে গিয়েছে) আচার্যদের অবস্থান ও বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলার সূত্র এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কয়েকটি যুক্তি এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে।

প্রথমত শুরুতে উল্লিখিত ময়ূরভট্টের কিংবদন্তি অনুসারে চৌদ্দ শতকের কবি ময়ূরভট্টের বংশধরেরা কনৌজ থেকে বর্তমানে শরিয়তপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। বিশ্বকোষের বর্ণনায় লক্ষ্মণ মিশ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যাকে উদ্ধৃত বংশলতায় ময়ূরভট্টের পরবর্তী পুরুষ হিসাবে দেখানো হয়েছে। বর্ণনা মতে সেন রাজা বিজয় সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্যামল সেন[১৫৯] কোটালী পাড়া জয় করেন। বিক্রমপুরে ফেরার পথে তিনি কোটালী পাড়ায় বসবাসরত খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যশোধর মিশ্রকে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই সময় বিক্রমপুরে একটি শকুনী মারা পড়ে। সংস্কার অনুযায়ী এতে অমঙ্গলের ছায়া নামে রাজ্যে। রাজা পুরোহিতদের ডেকে শকুনী যজ্ঞের আয়োজন করেন। সে অনুষ্ঠানে যশোধর মিশ্রও উপস্থিত ছিলেন। মিশ্র অনুষ্ঠানের মূল ত্রুটির কথা

www.pathagar.com

উল্লেখ করলেন। তাঁর মতে মন্ত্রের বলে শকুনকে নিয়ে আসতে হবে, যা স্থানীয় পণ্ডিতদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশেষে রাজার অনুরোধে যশোধর মিশ্র যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞ সফল হয়। সন্তুষ্ট রাজা পণ্ডিতকে প্রচুর ধনদৌলত দেন ও বসবাসের জন্য একখণ্ড জমি দান করেন। কিন্তু বিক্রমপুরে খাঁটি ব্রাহ্মণ নেই বিধায় যশোধর মিশ্র এখানে বসবাস করতে কুণ্ঠিত হন। পরে রাজা যশোধর মিশ্রের তালিকা অনুযায়ী কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণ আনার ব্যবস্থা করেন। এই ব্রাহ্মণদের পরবর্তী বংশধর লক্ষ্মণ মিশ্র। পরবর্তীকালে নদীর ভাঙ্গন দেখা দিলে লক্ষ্মণ মিশ্র বিক্রমপুর ত্যাগ করেন এবং তৎকালে দক্ষিণ বিক্রমপুর বলে পরিচিত বর্তমানে শরিয়তপুরের ধানুকায় এসে বসতি স্থাপন শুরু করেন। বংশলতা অনুযায়ী লক্ষ্মণ মিশ্র ময়ূরভট্টের পরবর্তী পুরুষ। সেই মতে তিনি চৌদ্দ শতকের শেষ বা পনেরো শতকের শুরুতে ধানুকায় বসতি গড়ে তোলেন।

দ্বিতীয়ত মনসাবাড়ির বিদুষী কন্যা কবি জয়ন্তী বা বৈজয়ন্তীর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে নিশ্চিত হয়েছি সাহিত্যের ইতিহাসের সূত্র থেকে। যদিও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সতের শতকের কবি বলেছেন তথাপি বংশলতিকার সূত্রে তা মেনে নেয়া যাচ্ছে না। লক্ষ্মণ মিশ্রের পরবর্তী চতুর্থ প্রজন্ম কবি জয়ন্তী দেবী। সাধারণভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম সময়ের দূরত্ব ২৫ বছর ধরা হয়। সেই হিসাব মতো কবি জয়ন্তী ষোল শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। শ্লোকে উদ্ধৃত তারিখটি বিবেচনা করলে জয়ন্তী অবশ্যই সতের শতকের মধ্যভাগের কবি। যদি তা মেনে নিতে হয় তবে বংশলতায় উদ্ধৃত লক্ষ্মণ মিশ্র থেকে জয়ন্তী পর্যন্ত প্রায় ৬ প্রজন্মের শূন্যতা অর্থাৎ generation gap রয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় হয়তো এ ব্যাপারে নিষ্পত্তি আসতে পারে।

মনসাবাড়ির কোথাও কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। কাল নিরূপণ করার উপযোগী সহায়ক উপাত্তও প্রায় অনুপস্থিত। তাই বিতর্কের অবকাশ রেখেও প্রাপ্ত তথ্য ও প্রত্নস্থল বিশ্লেষণ করে একটি কাল নিরূপণের প্রয়াস রাখা যেতে পারে।

ধানুকায় আচার্যদের বসতি গড়া প্রসঙ্গে বিশ্বকোষের বর্ণনা থেকে যে ধারণা পাওয়া গিয়েছে তাতে চৌদ্দ শতকে বা এর পরে কথিত ময়ূরভট্টের বাড়ির পত্তন ঘটেছিল। কারণ সাহিত্যের ইতিহাসের সূত্র অনুযায়ী ময়ূরভট্ট চৌদ্দ শতকের কবি। ময়ূরভট্টের পরবর্তী পুরুষ হিসাবে লক্ষ্মণ মিশ্র বিক্রমপুর থেকে ধানুকায় এসে বসতি গড়ে তুলেছিলেন। ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে মনসাবাড়ির মেয়ে কবি জয়ন্তীকে আমরা ষোল অথবা সতের শতকের মধ্যভাগের বলে চিহ্নিত করেছি।

মনসাবাড়ির ধ্বংসোন্মুখ স্থাপনাসমূহ বিশ্লেষণ করে উপর্যুক্ত সময়ের সঙ্গে একটি সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। পূর্বে বলা হয়েছে মনসাবাড়ির দক্ষিণ সীমানায় টোল বা শিক্ষায়তন ছিল। এর ইটের গাঁথুনি দেওয়াল ও মেঝের পলেস্তরার সুরকিতে চুন ব্যবহার করা হয়েছে। ইটের স্থাপত্যে চুনের ব্যবহার প্রধানত মুসলিম যুগেই লক্ষ করা যায়। তবে মুসলিম-পূর্ব যুগে হিন্দুদের নিকট চুনের ব্যবহার একেবারে অপরিচিত ছিল না। এ সময় মেঝের সুরকি জমাট করতে চুন ব্যবহার করা হতো। মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।[১৬০] তবে দেয়ালে চুন-সুরকির পলেস্তরা দেওয়ার রীতি মুসলিম-পূর্ব যুগে ব্যবহৃত হয়নি। মুসলিম যুগে দেওয়াল, ছাদ, গম্বুজ প্রভৃতির পলেস্তরায় চুনের ব্যাপক ব্যবহার হয় জল ও আর্দ্রতা প্রতিরোধের জন্য। টোলের ইমারত

www.pathagar.com

মুসলিম যুগের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। তবে একটি প্রশ্নের নিষ্পত্তি খুব সহজ নয়। তা হচ্ছে স্থাপনাটি মোগল-পূর্ব যুগের, না মোগল যুগের। মোগল-পূর্ব যুগের ইমারতের দেওয়ালের ইট সাধারণত নিরাভরণ থাকত। অর্থাৎ পলেস্তরা করা হতো না। কিন্তু টোলের দেওয়ালে পলেস্তরা রয়েছে। যদিও পোড়ামাটির শিল্পকর্ম লক্ষ করা যায়নি, তবে ইমারতের বাহ্যিক গঠন, বিশেষ করে কক্ষে প্রবেশের মুখে বেশ কতগুলো খিলানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যায়। এর গঠনরীতি সুলতানি যুগের ইমারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলে। এক্ষেত্রে আদিনা মসজিদ, ছোটসোনা মসজিদ প্রভৃতির খিলান লক্ষণীয়। অবশ্য ইমারতে খিলানের ব্যবহার মোগল যুগেও যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। এদিক বিচারে টোলের ইমারতটি সুলতানি যুগের শেষ দিকে অথবা মোগল যুগে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। সুতরাং বোঝা যায় ধানুকায় আচার্যদের আগমনের পরে ইমারতটি তৈরি হয়েছিল। কনৌজের এই ব্রাহ্মণ আচার্যদের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত টোল স্থাপিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। প্রথম অবস্থায় সাধারণ আচ্ছাদনের তৈরি টোলে হয়ত পাঠদান করা হতো। কালক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এক সময় প্রয়োজন পড়ে এই বড় আকৃতির ইমারত তৈরি করা। কবি জয়ন্তী মনসাবাড়ির টোলেই পিতার কাছে বিদ্যাচর্চা করেছেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। জয়ন্তী যদি ষোল শতকের কবি হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই তখন এই টোলের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমান ইমারতটি সে সময়ে তৈরি নাও হতে পারে। অন্যদিকে জয়ন্তী সতের শতকের মধ্যভাগের কবি হয়ে থাকলে টোলের ইমারতটি তখন অবশ্যই ছিল। এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে– তা হচ্ছে টোলের ইমারতের চেয়ে মন্দিরবাড়ির ইমারতগুলো অনেক বেশি নবীন। আর এগুলোর গঠন-বৈশিষ্ট্য থেকে সময় নিরূপণ অনেক বেশি সহজ। মন্দিরবাড়ির ইমারতগুলো তুলনামূলক অনেকটাই অক্ষত। মনসামন্দির ও দুর্গামন্দির দোচালা বাংলো প্যাটার্নের ছাদবিশিষ্ট। বাংলাদেশে বাঁশের তৈরি দোচালা ও চৌচালা ঘর প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। বৃষ্টিপ্রধান দেশ বলে সহজে বৃষ্টির পানি নেমে যাওয়ার বাস্তববোধ থেকে এ জাতীয় ছাদের ধারণা আসে। মুসলিম যুগে বাঁশের বদলে এই ধারার ছাদ ইটের গাঁথুনিতে তৈরি হতে থাকে। মুসলিম-পূর্ব যুগের কোনো ইমারত বা অঙ্কিত ছবিতেও এ জাতীয় রীতির ইমারত গড়ার আভাস পাওয়া যায় না।[১৬১]

চৌচালা রীতির ছাদ বা গম্বুজ মুসলিম যুগের প্রথমদিকে অর্থাৎ সুলতানি বাংলায় লক্ষ করা যায়। বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও গৌড়ের ছোটসোনা মসজিদ এর উদাহরণ। দোচালা রীতির বাংলো প্যাটার্নের ছাদ মূলত মোগল যুগে লক্ষ করা যায়। এর প্রাচীনতম উদাহরণ সম্রাট শাহজাহানের আমলে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ে তৈরি ফতেহ খানের সমাধি সৌধ। একই রীতিতে দোচালা ছাদবিশিষ্ট মন্দিরগুলো তৈরি হতে থাকে মোগল যুগেই।[১৬২] সতের শতকে ফরিদপুরের রাজৈরে তৈরি জোড়াবাংলো দ্বিতল মন্দির ও পাবনায় আঠারো শতকে তৈরি জোড়াবাংলো মন্দিরসহ আর কয়েকটি মন্দিরের কথা জানা যায়। মনসাবাড়ির পূর্বোল্লিখিত মনসামন্দির ও দুর্গামন্দির উপরে উদ্ধৃত সমাধি ও মন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত। সুতরাং বোঝা যায় এই মন্দিরগুলো সতের শতকের আগে তৈরি হয়নি। মনসাবাড়ির মন্দিরগুলো মোগল যুগের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। যেমন মোগল যুগের ইমারতের দেওয়ালে ব্যাপকভাবে পলেস্তরা করা

www.pathagar.com

হতো। মন্দিরবাড়ির সব কটি ইমারতেরই এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রাক-মোগল যুগে, পনের শতকের শুরুতেই ইমারতের গায়ে উজ্জ্বল টালির অলংকরণ ব্যবহৃত হতে থাকে। অলংকরণে ফুলের ডিজাইন প্রাধান্য পায়।[১৬৩] মনসাবাড়ির মন্দিরের গায়ে এই জাতীয় অলংকরণ রয়েছে। মনসামন্দিরের সম্মুখস্থ ছাদের নীচে ১১টি অলংকৃত টালি ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রতিটির মাঝখানে একটি বড় আকারের পদ্ম রয়েছে। দুর্গামন্দিরের মূল প্রবেশ পথের খিলানের উপর এবং ছাদের নিচের প্যানেলে অপূর্ব দক্ষতায় তৈরি ফুলদানিতে ফুল ও লতাপাতার অলংকরণ লক্ষণীয়। এই মন্দিরের পূবদিকের পার্শ্ব-দেওয়ালে রঙ্গিন টালি ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য মোগল যুগেও এই জাতীয় মোটিফ ব্যবহার যথেষ্ট দেখা গিয়েছে।

সুতরাং উপরের স্থাপত্যিক বর্ণনা অনুযায়ী ধারণা করা চলে পনের শতক বা তার পরবর্তী কোনো সময়ে টোল গড়ে তোলার পর মনসাবাড়িতে জনবসতি বৃদ্ধি পায়। টোলের ইমারতের বিশালত্ব অনুমান করতে সাহায্য করে যে হয়ত এখানে শিক্ষার্থীদের আবাসনেরও ব্যবস্থা ছিল। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির স্থাপনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তাই ষোল শতক থেকে মন্দিরবাড়ির ইমারতগুলো তৈরি হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় লক্ষ করা যেতে পারে। মনসাবাড়ির সীমানা থেকে দুশো গজ দক্ষিণে বিশাল শিবমন্দির রয়েছে। বোঝা যায় মনসাবাড়ি সর্বসাধারণের জন্য গড়া হয়নি। ব্রাহ্মণ আচার্যদের এই প্রতিষ্ঠান সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। সেনযুগ থেকেই দেখা যায় বর্ণবৈষম্য তীব্র হয়েছে হিন্দু সমাজে। সংস্কৃত চর্চায় ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য ছিল। সাধারণ হিন্দুর কোনো রকম প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। বিশেষ করে সংস্কৃত টোল হিন্দুদের জন্য কখনই সর্বজনীন ছিল না। তাই প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রাজা-জমিদার বা ব্রাহ্মণ-আচার্যদের বাড়ির এলাকার ভেতর দুর্গামন্দির গড়া হতো। শিব ছিলেন সাধারণের দেবতা। তাই উল্লিখিত বিশেষ বাড়ির বাইরে তৈরি করা হতো শিবমন্দির। সাধারণ মানুষের পূজা করার সুযোগ ছিল সেখানে। এই ঐতিহ্যকে ধারণ করেই মনসাবাড়ির বাইরে শিবমন্দিরের অবস্থান। মনসাবাড়ির মন্দিরস্থ ইমারতগুলোর সমকালীন ছিল এই শিবমন্দির। কারণ এর গঠন-শৈলীতে মুসলিম যুগের প্রভাব স্পষ্ট। সাদা বেলে পাথরের প্লাটফর্মের উপর মন্দিরটি দাঁড়ানো, পরপর দুটো দরজা পেরিয়ে মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশপথের দরজা মুসলিম রীতি অনুযায়ী খিলানাকৃতিতে গড়া। ভেতরের খিলানের উপর অলংকরণ রয়েছে। হিন্দু মোটিফ প্রজাপতির দুই পাশে রয়েছে পদ্ম। মন্দিরের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ছাদের উপরে কৌণিক চূড়ায় রত্ন থাকার কথা। সেই মতে তিনরত্নের মন্দির হওয়ার সুযোগ ছিল এখানে। অথচ শুধু পূর্বদিকের একটু বাড়তি অংশে একটি যথার্থ রত্ন রয়েছে। এই রত্নের দুই পাশে দুটো চূড়া রয়েছে। কিন্তু সেখানে রত্নের বদলে যা গড়া হয়েছে তার সঙ্গে মসজিদের গম্বুজের সাদৃশ্য স্পষ্ট। মনসাবাড়ির এক-দুই কিলোমিটারের ভেতরের অন্তত দুটি একগম্বুজ বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতির মোগল আমলের মসজিদ রয়েছে। এই মসজিদসমূহের গম্বুজের সঙ্গে আলোচ্য শিবমন্দিরের গম্বুজাকৃত চূড়ার সম্পর্ক স্পষ্ট। সুতরাং হয়তো সমসাময়িককালে একই কাজে অভিজ্ঞ কারিগরগণ

www.pathagar.com

এই মন্দির তৈরি করেছিলেন। তাই মন্দিরটি মোগল যুগেই তৈরি হয়েছে বলে ধারণা করা চলে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মনসাবাড়ির আচার্যদের বংশলতার সংকলক পাণ্ডুলিপিতে একটি রাবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করেছেন। তাতে বাড়িটি 'মহিমচন্দ্র ভট্টাচারিয়া এস্টেট' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এতে করে ধারণা করা সহজ হয়েছে যে, ব্রিটিশ যুগে অর্থাৎ আঠার শতকের শেষেও মনসাবাড়ির কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। এই হিসাব মতো আমরা মনসাবাাড়ির সচল অবস্থান পনের শতক থেকে আঠার শতক বলে অনুমান করতে পারি।

সমকালীন ইতিহাসগ্রন্থ, সাহিত্য, শিলালিপি, পর্যটকের বিবরণী বা আত্মজীবনী-মূলক গ্রন্থ ইত্যাদি কোনো ধরনের আকর সূত্র পাওয়া যায়নি মনসাবাড়ির ইতিহাস লিখনে। ফলে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে একটি ইতিহাসের রূপরেখা দাঁড় করানোর প্রয়াস পেতে হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে ইতিহাসের গবেষণায় যে তথ্যভিত্তিক প্রমাণ খোঁজার দায়িত্ব রয়েছে সে ব্যাপারে সতর্ক থেকেই এই গবেষণা অগ্রসর হয়েছে। গবেষণায় যেটুকু আলোর প্রক্ষেপণ ঘটেছে তাতে মনসাবাড়ির রহস্যের কিছুটা হয়ত উন্মোচিত হয়েছে। মধ্যযুগে সংস্কৃত শিক্ষালয় টোল অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দুর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনসাবাড়ির অবস্থান সে সময়ে শরিয়তপুরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সন্ধান দিচ্ছে। মধ্যযুগের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সংযোজিত হয়েছে একটি নতুন দৃশ্যপট। এই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এ ক্ষেত্রে অন্তত একটি কৌতূহলকে উজ্জীবিত করেছে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় প্রাথমিক কোনো সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেলে হয়ত ইতিহাস বাস্তব ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত হবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার যাত্রা মাত্র দেড় দশকের। মাঠ পর্যায়ে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য এখনও তৈরি হয়নি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ এখনও সূচনাপর্বেই রয়েছে। তবুও পদ্ধতিগত প্রত্নতত্ত্ব চর্চার যাত্রা যেটুকু এগিয়েছে তাতে এদেশের ঐতিহ্য অনুসন্ধানে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। প্রত্নতত্ত্বের জ্ঞান ব্যবহার করে, প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানমনস্কভাবে ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। গত এক দশকে মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। এসব প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রত্নসূত্রসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে ইতিহাস পুনর্গঠনের সম্ভাবনা। বিভিন্ন সময়ে বিষয় ভিত্তিক গবেষণা জার্নালে এসব আবিষ্কারের রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও তা সকল শ্রেণীর পাঠকের সামনে এখনও তেমনভাবে উন্মোচিত হয়নি। ঐতিহ্য উন্মোচনের মাধ্যমে ইতিহাস পুনর্গঠনের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে রয়েছে তারই কয়েকটি বিনীত উপস্থাপনা। গবেষণার ধারাবাহিকতার ভেতর থেকে একটি নির্বাচিত সঞ্চয়ন বলে প্রবন্ধটির কোনো পরিসমাপ্তি নেই। নতুন নতুন গবেষণা একে দীর্ঘায়িত করবে। একটি জাতির ঐতিহ্য উন্মোচন ও ইতিহাস পুনর্গঠনের এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. S. J. Knudson, *Culture in Retrospect* , Houghton Miffin Co. Boston 1978, p. 453

২. Chakrabarti, D. K., *A History of Indian Archaeology from the Beginning to 1947*, Delhi, 1988, p. 1

৩. Alexander Cunningham, *Archaeological Survey of India, Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879-80 from Patna to Sonargaon* Vol-XV, pp. 39-166

৪. Enamul Haqu, *Survey of Museum & Archaeological Education & Training in East Pakistan*, Dacca, 1970, p. 69

৫. Ibid

৬. M. Mohar Ali, *An Outline of Ancient Indo-Pak History*, Khulna , Published by Ali, 1st ed. 1960, pp. 3-4

৭. ফিউদর করোভকিন, *মানুষের ইতিহাস-প্রাচীন যুগ*, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃ. ৬৫

৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাঙলাদেশের ইতিহাস* (২য় খণ্ড, মধ্যযুগ), কলিকাতা, জেনারেল, তৃতীয় সং, ১৩৮৫ বাংলা, পৃ. ২৬৩

৯. ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, কলিকাতা, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, পৃ. ২৪৫

১০. মমতাজুর রহমান তরফদার, 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব', *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

১১. D. K. Chakrabarti, *Ancient Bangladesh:A Study of Archaeological Sources*, Dhaka, UPL, 1992, P. 34

১২. ঐ

১৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Jayanta Singh Roy, Syed M. Kamrul Ahsan, A Study of Prihistoric Tools on Fossil Wood from Chaklapunji, Hobigonj, Pratnatattva, vol. 6. 2000, Department of Archaeology, Jahangirnagar University

১৪. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৪. পৃ. ২৩

১৫. শাহ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, 'উয়ারি-বটেশ্বরে প্রাপ্ত কাঁচের পাঁতি : একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা,' *প্রত্নতত্ত্ব*, সংখ্যা ৯, ২০০৩, পৃ. ২-৪

১৬. Shah Sufi Mostafizur Rahman, 'Archaeology of Wari-Bateshwar Region, Bangladesh', *Proceedings of the 17th Conference of the International Association of Historians of Asia*, Dhaka, 2004, p. 15

১৭. ঐ, p. 16

১৮. সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস* ১ম খণ্ড, শিব শঙ্কর মিত্র সম্পাদিত, কলকাতা, পৃ. ১৩৫

১৯. K.N. Dikshit, *Archaeological Survey of India*, Asiatic of India, ১৯২৩, দ্র. ৭৬.

২০. *বাংলাপিডিয়া* খণ্ড ৭, ড. সিরাজুল উসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৩১৭

২১. Safiqul Alam, 'Excavation at Bharat Bhayna Mound, Bangladesh : A Preliminary Report', *Man and Enviornment*, Vol-XII, p. 76

www.pathagar.com

২২. L.S.S. O Malley, *Bengal District Gazetteer's Jessore*, Calcutta, 1912, p-2r
২৩. *Ibid*
২৪. *Ibid*
২৫. সতীশ চন্দ্র মিত্র, পৃ. ১১৭
২৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়*, কমলা বক্তৃতামালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৬, পৃ. ৭৭; *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, জেনারেল, পৃ. ২৬০
২৭. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়*, পৃ. ১৪
২৮. ঐ, পৃ. ১৪
২৯. ঐ, পৃ. ১৫
৩০. ঐ, পৃ. ২৫-২৬
৩১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, পৃ. ২৩১-৩২
৩২. ঐ, পৃ. ২৩৫
৩৩. Minhaj-ud-din-Abu Umar-i-Usman, Tr. H. G. Reverty, *Tabakat-i-Nasiri, vol: 1-2*, Oriental Book Reprint Corporation, New Delhi, Reprint, 1970, p. 559, Foot Note-2
৩৪. Shamsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal-vol-iv*, Rajshahi, Varendra Research Museum, 1960, pp. 13-21
৩৫. Asoke Kumar Bhattacharyya, `An Unpublished Arabic Inscription on a Jaina Image from Maldah, *Journal of the Asiatic Society Letters*, vol-XVIII, No-1, 1952 pp. 9-13
৩৬. Shamsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal*-vol-iv, pp. 9-13
৩৭. ঐ
৩৮. ঐ
৩৯. মূর্তি তৈরি বা ছবি আঁকা আল কুরআন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা না করলেও তাকে এড়িয়ে চলতে নির্দেশ দিয়েছে। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুহম্মদ (সা.) বলেছেন যে, শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ চিত্রকরদের চরম শাস্তি দেবেন।
Sir Thomas W. Arnold, Painting in Islam, M. C. M. XXXVIII, Oxford at the Clarendon Press, 1928, p. 5
৪০. হরবংশ মুখিয়া, 'মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি' *সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা*, কলিকাতা, কে. পি, বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৯ পৃ. ৮৬-৮৭
৪১. David McCatchion, 'Hindu-Muslim Artistic Continuities in Bengal', *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, XIII, No. 3, 1968, p. 235
৪২. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৪
৪৩. Monmohan Chakravorty, 'Pre-Mughal Mosques of Bengal', *Journal of the Asiatic Society of Bengal, (N.S)* vol-1, 1910, pp. 24-25
৪৪. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর (স্বাধীন সুলতানদের আমল)*, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৫১, ৫৩
৪৫. Abid Ali, *Memoirs of Gaur and Pandua*, Calcutta, Bengal Secretariet Book Depot, 1924, p. 129
৪৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর*, পৃ. ৫২

www.pathagar.com

৪৭. Yolande Crowe, 'Reflection on the Adina Mosque at Pandua', *Islamic Heritage of Bengal*, Paris, UNESCO, 1984, p. 163
৪৮. Abid Ali, *Memoirs* p. 82, Foot note
৪৯. Jagadish Narayan Sarkar, *Thoughts on Trends of Cultural Contacts in Medieval India*, Calcutta, 1984, p. 66
৫০. Mohamahopdhyaya Pandit Bisheswar Nath, 'Coins Struck by the Early Arab Governors of Sind', *Journal of the Numismatic Societies of India* (JNSI), 1947, p. 125
৫১. মুদ্রা অঙ্কনের রীতি, লিখন পদ্ধতি ও মুদ্রা খোদাইয়ের মাধ্যম সম্পর্কে বিস্তারিত পাঠের জন্য C. J. Brown, *The Coins of India*, Indological Book House, 1973, Reprint-p. 69
৫২. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৮৫-৮৬
৫৩. Ashoke Kumar Bhattacharia, 'Hindu Element in Early Muslim Coinage', *JNSI*, Vol XVI, pp. 113-14
৫৪. Parmeshwari Lal Gupta, *Coins*, New Delhi, 1991, p. 81
৫৫. A. Karim, 'The So-called Bengal Coins of Sultan Shams-al-Din Iltutmish', *JNSI*, Vol XXII, p. 205
৫৬. Nicholas W. Lowiet, 'The Horse-man Type of Bengal Coins and the Question of Commemorative', *JNSI*, Vol XXXV, pp. 197-208
৫৭. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, পৃ. ১৬০
৫৮. A. S. Atakar, 'A Bull and Horseman Type of Coins of the Abbasid Chaliph Muqtadir Billah-Al-Jafar', *JNSI*, Vol VIII, Part-1, p. 75
৫৯. মমতাজুর রহমান তরফদার, 'মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মুদ্রা অঙ্কনে একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য', *ইতিহাস*, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ. ১৫২
৬০. A. S. Atakar, 'A Bull and Horseman Type of Coins... p. 77
৬১. Shamsuddin Ahmad, *Inscriptions of Bengal*, Vol-IV, Rajshahi, Varendra Research Museum, 1960, pp. 113-27
৬২. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা), *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, কলিকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ৯০
৬৩. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৮৩
৬৪. নারায়ণ দেব, *পদ্মপুরাণ*,তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৪৭, পৃ. ৩৩৬
৬৫. মাহমুদা খাতুন, 'মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ', ঢাকা, *সুন্দরম*, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৯৯, পৃ. ২৭
৬৬. বিজয় গুপ্ত, *মনসামঙ্গল*, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৪৩
৬৭. এ কে এম শাহনাওয়াজ, সুলতানী বাংলার শহর 'হযরত জালাল সোনারগাঁও' : কতিপয় প্রাথমিক সূত্রের সাক্ষ্য. *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৫১-৬৪
৬৮. Edward Thomas, *The Chronicles of the Pathan King of Delhi*, Delhi, Munshiram Monoharlal Oriental Publishers, 1967, p. 147
৬৯. M Mir Jahan, *Mint Towns of Medieval Bengal*, p. 225
৭০. Nalinikanta Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, Cambridge, 1922, p. 11

www.pathagar.com

৭১. Abdul Karim, 'Corpus of the Muslim Coins of Bengal, Down to A.D. 1538,' *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, 1960, p. 26
৭২. ঐ, পৃ: ২৫, এখানে উৎকীর্ণ লিপি ছিল (খারাজবঙ্গ বা বঙ্গের ভূমি রাজস্ব)। Abdul Karim: *Aspects of Muslim Administration in Bengal Down to A.D. 1538, Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, 111, 1958, p 74
৭৩. Abdul Karim: Corpus, p. 158
৭৪. Staplton, H.E: *Contributions to the History and Ethnology of North Eastern India*, IV (Proc) N-S Vol. XIII, 1922, p. 1913. আব্দুল করিম: *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃ. ৫২
৭৫. Journal of the Numismatic Society of Bengal, Vol. XVIII, pp. 76-77.
৭৬. অসীম রায়: 'বঙ্গ বৃত্তান্ত' কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১২২
৭৭. ঐ
৭৮. Aga Mahdi Husain: Studies in the *THUFATUNNUZZAR* of the Batruta and Ibn Juzayy JASB, XXVI, No-1 Apr. 1978, p. 32-33
৭৯. অসীম রায়: বঙ্গ বৃত্তান্ত, পৃ. ১২২, ১২৩
৮০. ঐ, ১২৩
৮১. Harinath De (Jr) *Ibn Batuta's Account of Bengal*. Calcutta-1978, pp. 6, 16
৮২. H. Blochman: *Contributions to the Geography and History of Bengal*. Calcutta, Asiatic Society, 1968, pp. 28-29
৮৩. Abdul Krim: *Corpus*, 160
৮৪. Shamsuddin Ahmad: *Inscriptions of Bengal Vol-IV*, Rajshahi, Varendra research Museum. 1960. p. 169
৮৫. H. Blochman *Contributions*, p. 192
৮৬. Shamsuddin Ahmad: *Inscriptions*, p. 192
৮৭. H. Blochman *Contributions*, p. 29
৮৮. ঐ
৮৯. Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufiism in Bengal, Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1975, p. 23
৯০. Abdul Krim: *Corpus*, pp. 16, 19, 36, 38, 43, 51
৯১. H. Nelson Wright, Catalouge of the Coins in the Indian Museum Calcutta, Indological Book House, 1972, pp. 153-154
৯২. Abdul Krim: *Corpus*, p. 9
৯৩. ঐ, p. 16
৯৪. ঐ, p p. 26, 33
৯৫. ঐ, p. 36
৯৬. Jagadish Narayen Sarker, *Hindu-Muslim Relation in Bengal (Medieval Period)*, Delhi, 1985, p. 19
৯৭. Shamsuddin Ahmad: *Inscriptions*, p. 12 1
৯৮. ঐ, p p. 209-10
৯৯. আবদুল করিম, 'পাক ভারতীয় সংস্কৃতিতে উসলামের প্রভাব', *সমাজ ও ঐতিহ্য*, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পূর্ব পাকিস্তান, পৃ. ৬৩
১০০. মমতাজুর রহমান তরফদার, 'মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের মুদ্রা অঙ্কনে একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য', *ইতিহাস*, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ. ১৫২
১০১. অসীম রায়: বঙ্গ বৃত্তান্ত, পৃ. ১২২

www.pathagar.com

১০২. মুনতাসির মামুন, ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ভূমিকা-১
১০৩. Abdul Karim, *Dacca The Mughal Capita,l* Asiatic Society of Pakistan 1964, p. 1
১০৪. M. Mir Jahan, *Mint Towns of Medieval Bengal* Proc. of the Pakistan History Conference, Pakista Historical Society 1953, pp. 228, 229
১০৫. Edward Thomas, *The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi*, Munshiram Mohonlal Oriental Publishers, Delhi, 1967, p. 147
১০৬. Shamsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal* pp. 62-63. ; Abdul Karim, *Corpus of the Arabic* and *Persian Inscription of Bengal*. Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, pp. 135-136
১০৭. Ahmad Hasan Dani, *Biblography of the Muslim Inscriptions of Bengal* Dacca, Asiatica Society of Pakistan, 1957, p. 110
১০৮. Abdul Karim, *Corpus* p. 136
১০৯. ঐ, pp. 136-37
১১০. Shamsuddin Ahmed, *IB*. pp. 57-58 ; Abdul Karim, *Corpus* pp. 130-134
১১১. Shamsuddin Ahmed, *IB*. pp. 62-64; Abdul Karim, *Corpus* pp. 134-137
১১২. Shamsuddin Ahmed, *IB*. pp. 62; Abdul Karim, *Corpus* pp. 134
১১৩. *Antiquities*, Dacca, 1904, p. 132
১১৪. Abdul Karim, *Corpus* p. 132
১১৫. Shamsuddin Ahmad, *IB*.p. 58
১১৬. Abdul Karim, *Corpus* p. 136
১১৭. Abdul Karim, *Origin and Development of Mughal Dhaka*; Dhaka Past and Present (ed. by Sharif Uddin Ahmed), Asiatic Society of Bangladesh, 1991, p.40, (Notes-1)
১১৮. W.W.Hunter, *Report of the Education Commission*, Calcutta, 1883, pp.56-57
১১৯. W. Adam, *Third Report on the State of Education in Bengal*, Calcutta-1838, p. 59
১২০. S. M. Jaffar, *Education in Muslim India*, 1st ed. Delhi, Idhara-i-Adibiyat-i-Delhi, 1972, pp. 17-20
১২১. C. Stewart, *History of Bengal*, Calcutta, 1910, p. 371
১২২. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলা ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ: ২৩০
১২৩. S. H. M. Rizzvi; Shibani Ray, Muslim Bio-Cultural Perspective, Delhi, B.R. Publishing Corporation, 1948, pp. 42-43
১২৪. Abdul Karim, *Corpus* pp. 189-191, Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufiism in Bengal*, p. 233
১২৫. আবদুল করিম, 'পাক ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব', *সমাজ ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৬৩
১২৬. Shamsuddin Ahmad, *IB*.p. 232, Abdul Karim, *Corpus* pp. 359-60
১২৭. Shamsuddin Ahmad, *IB*.pp. 238-39, Abdul Karim, *Corpus* pp. 365-366
১২৮. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Asiatic Society of Pakistan, No. 7, Dacca, 1961, pp. 109, 139, 164, Abid Ali, *Memoir*, pp77, 82. 129; Shamsuddin Ahmad, *IB*.pp. 195-200

www.pathagar.com

১২৯. Muhammad Abdul Qadir, `The So-called Ladies Gallery in the Early Mosques of Bangladesh,' *JVRM*, Vol-7, 1981-82, pp. 161-72
১৩০. ড. মো. আহসান হাবীব, প্রত্নস্থল বারবাজার . যশোহর খুলনার ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন (১২০০-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ), একটি অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬
১৩১. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ.-২০৮
১৩২. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers, Jessore*, Calcutta, 1912, P. 23
১৩৩. আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮
১৩৪. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, পৃ. ১৯৮
১৩৫. K. G. M. Lutful Bari (ed.), *Bangladesh District Gazetters*, Jessore, 1979, B.G. Press. p.1
১৩৬. সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোর-খুলনার ইতিহাস*, ১-২ খণ্ড, খুলনা, ২০০০, পৃ.১১৭
১৩৭. R.C. Majuder (ed.), *History of Bengal* Vol-1, Dacca, 1923
১৩৮. ঐ
১৩৯. মো. মোশারফ হোসেন, *বাংলাদেশের নগর ঃ উদ্ভব ও বিকাশ*, ঢাকা, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০১, পৃ. ৩৩২
১৪০. সতীশ চন্দ্র মিত্র, ঐ, পৃ. ১৭৭
১৪১. ঐ
১৪২. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, পৃ. ১১৮
১৪৩. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961, p. 142
১৪৪. এ বি এম হোসেন, *বাংলা পিডিয়া* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭
১৪৫. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, p. 11
১৪৬. Abdul Karim, Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, pp. 333-334
১৪৭. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, pp. 159-160; ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০২.পৃ. ১১২-১১৩
১৪৮. Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal*, Chittagong, Baitush Sharaf Islamic Research Institute, 1985, p. 150
১৪৯. Abdul Latif, *Accounts*, Calcutta, Bengal Past and Present, 1928, pt.II, sl. 70. p. 143. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1904, No. 2, p. 112
১৫০. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Karachi, Pakistan Publishing House, 1967, p. 292
১৫১. মানচিত্র সংকলিত হয়েছে-শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত; *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, কলকাতা ১৬১৩ সাল
১৫২. শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড*, কলকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা পৃ. ১১০
১৫৩. প্রফুল্লচন্দ্র আচার্য: *প্রবাসী* মাঘ ১৩২৮ পৃ. ৫২০
১৫৪. নগেন্দ্র ভট্টশালী: *প্রবাসী* ফাল্গুন ১৩২৮ পৃ. ৬৬২

www.pathagar.com

১৫৫. সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৭; শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য: *কবি জয়ন্তীদেবী* হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত তারিখ ২৪-৭-৫৮

১৫৬. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী: *প্রাচীন মহিলা কবি জয়ন্তী* ইত্তেফাক, ২৮ জুলাই ১৯৬৩

১৫৭. শ্রী নগেন্দ্র নাথ বসু: *বিশ্বকোষ*-১ (সংকলিত ও প্রকাশিত) বৈদিক পাশ্চাত্য অধ্যায়ে সংকলিত (উনবিংশ ভাগ)

১৫৮. পূর্বোল্লিখিত সূত্রে কালিদাস পর্যন্ত বংশ তালিকা ছিল। বর্তমান পর্যন্ত বাকিটুকু সূত্রবদ্ধ করেছেন বর্তমান শরিয়তপুর সরকারী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব এম, এ আজিজ মিয়া

১৫৯. শ্যামল সেনের নাম তাম্রশাসন বা অন্য কোনো লিপি প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র কুলজী গ্রন্থগুলো থেকে এই নাম ও কাহিনীর জন্ম হয়েছে বলে আমাদের ধারণা

১৬০. Ahmed Hassan Dani: *Muslim Architecture in Bengal.* Asiatic Society of Pakistan. Dacca. 1961. p. 11

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩ পাদটীকা-৪

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ২

অতুল সুর, ড. ৭

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (হুসেন শাহ) ৬, ২৪, ৩০, ৩১, ৩৬

ইবনে বতুতা ৩৫

উয়ারী বটেশ্বর ১, ৩, ১০-১২

কান্তজীর মন্দির ৪

খান জাহান আলী (খান-ই-জাহান) ৪৬, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৬

গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ ৬, ২৬, ৩০
গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ ৪৫

চন্দ্রকেতু গড় ২০, ৪৯
চন্দ্রবর্মণ কোট ১৯, ২০, ৫০
চাকলাপুঞ্জি ৩, ৮
চুনারুঘাট ১, ৩, ৮

ছোট কাটরা ৪

জাফর খাঁ গাজী ২৪-২৬
জালাল উদ্দিন ফাতেহ শাহ ২৯, ৩০, ৩৬
জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ ২৪, ২৯
জিঞ্জিরা দুর্গ ৪
জেমস ওয়াইজ ৩৬

টলেমি ১১

নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ ২৯, ৪১, ৪২, ৪৭, ৪৯
নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ ৩৮, ৪৫, ৫৭, ৬০

দনুজমর্দ্দন দেব ৩০, ৩১

পাহাড়পুর বিহার ১, ৩
পুণ্ড্রনগর ১১

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ৩২
ফাহিয়েন ৫

বখতিয়ার খলজি ২১, ২৯, ৩২
বড় কাটরা ৪
বাগেরহাট ৪, ৪৬, ৪৭-৫৭
বাঘা ৩
বাবা সালেহ ৩০
বারবোসা, ডুয়ার্তে ৩৯
বারোবাজার ৪, ৪৬-৪৯
ব্লখম্যান ৩৬, ৩৭
বেংঘলা ৩৪, ৩৫
ভরতভায়না ১, ৩, ১০, ১৩-১৫, ১৭-২০, ৫০
ভারথেমা ৩৪,৩৫,৩৯
মওলানা শাহ দৌলা ৫৯
মনসাবাড়ি ৪, ৬২-৭২
ময়নামতি ১, ৩, ১০
মহাস্থানগড় ১, ২, ১০, ১১
মহেন্দ্রদেব ৩০, ৩১
মাওলানা আ'তা ওয়াহিদ উদ্দিন ৩০
মোহাম্মদ বিন সাম ২৯

রমেশচন্দ্র মজুমদার ৭, ২২-২৪
রাজা গণেশ ২৬
রালফ ফিচ্ ৩৫
রামচরিত ৫

লখনৌতি ২২, ৩১, ৩৩
লক্ষণাবতী ২২
লালবাগ দুর্গ ৪
লালমাই ১, ২

শরফুদ্দিন আবু তওয়ামা ২৬, ৩৯, ৪৪
শামসুদ্দিন আহমদ শাহ ৩৬
শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহ ৩১-৩৪, ৩৮
শাহ লঙ্গর ৩৬
শ্রী চৈতন্য ৭

সতীশ চন্দ্র মিত্র ১৩, ১৪, ১৫
সন্ধাকর নন্দী ৫
সাতগাঁও ২১, ৩১
সিকান্দর শাহ ৩৩
সীতাকোট বিহার ৩
সোনারগাঁও ৪, ২১, ২২, ৩১-৪১, ৪৪, ৪৫
স্টাপলটন ২৬, ২৭
স্মীথ, ভি. এ. ৬

হিউয়েন সাঙ ৫, ১০, ১৪, ১৯

www.pathagar.com

উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত প্রাচীন রাস্তা

উয়ারী বটেশ্বরে উৎখননে প্রাপ্ত আদিকালে মাটির গর্তে মানব বসতি (অনুমান)

www.pathagar.com

উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত লৌহ হাত কুঠার

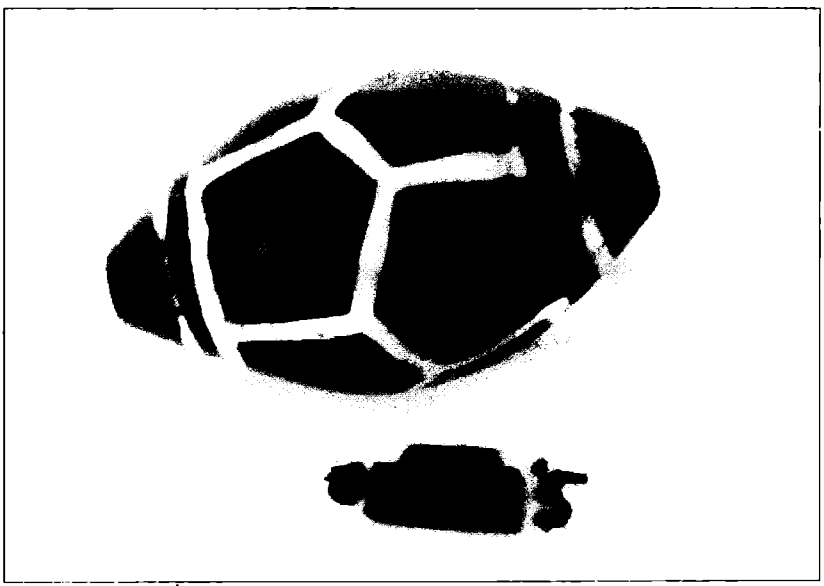

অলংকৃত পুঁতি, উয়ারী বটেশ্বর

www.pathagar.com

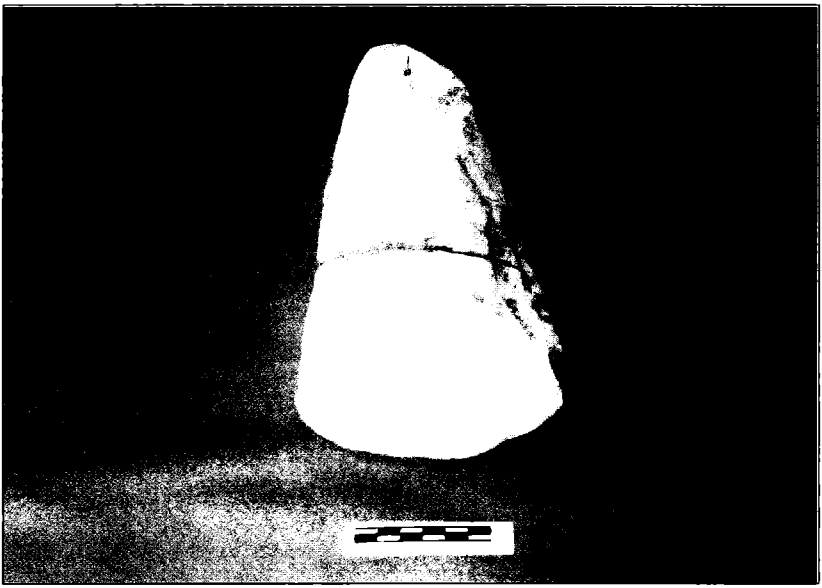

নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার, উয়ারী বটেশ্বর

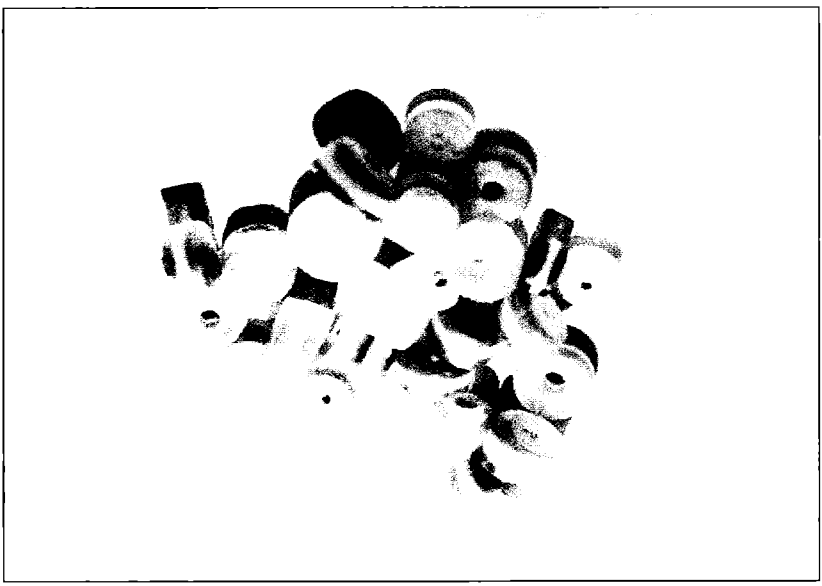

পাথরের পুঁতি, উয়ারী বটেশ্বর

www.pathagar.com

উৎখননের পর ভরত ভায়না ঢিবি

ভরত ভায়না : উৎখননের পর কক্ষের দেয়াল

www.pathagar.com

পোড়ামাটির অলঙ্কার : ভরত ভায়না

পোড়ামাটির শিল্প : ভরত ভায়না

www.pathagar.com

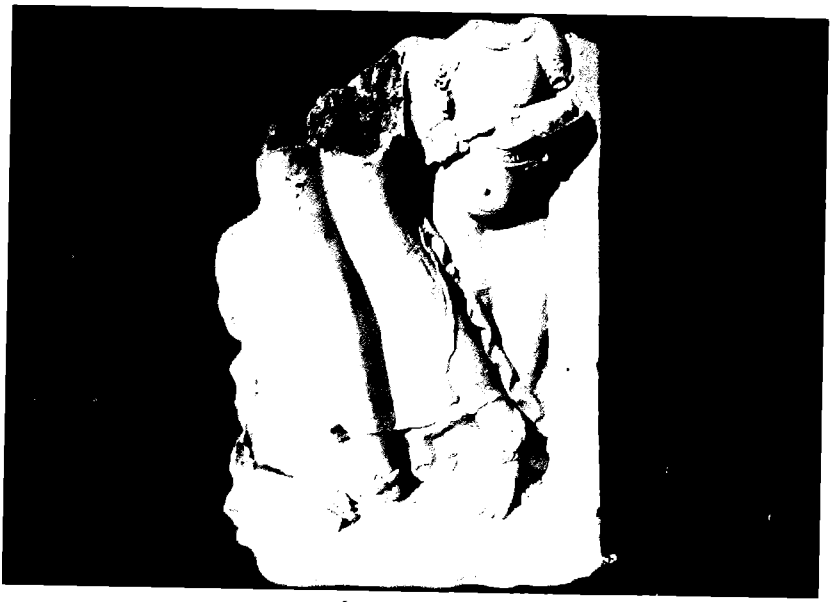

পোড়ামাটির ফলক : ভরত ভায়না

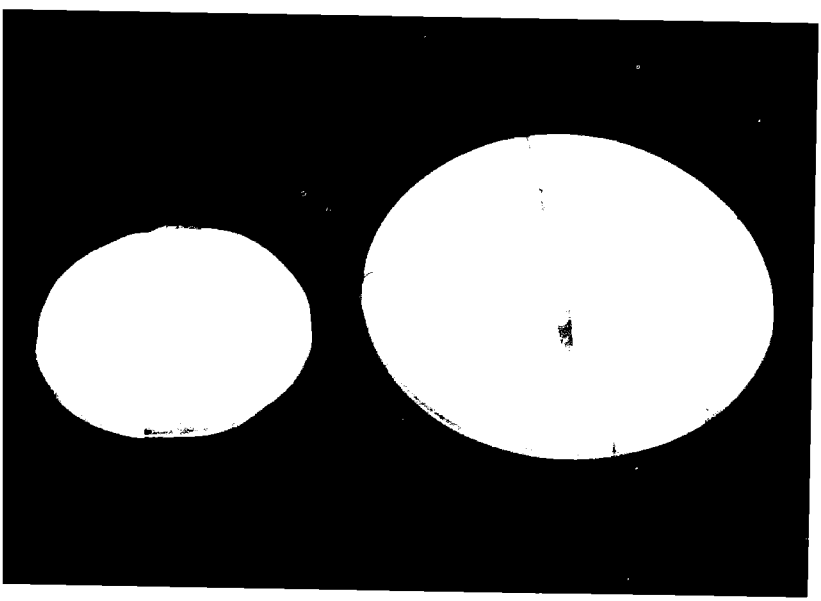

মৃৎপাত্র : ভরত ভায়না

www.pathagar.com

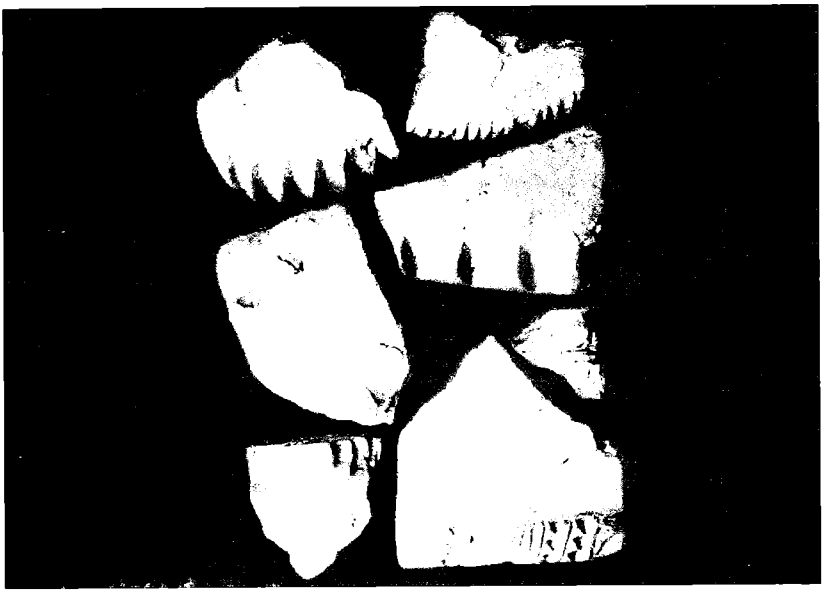

অলঙ্কৃত ইট : ভরত ভায়না

পোড়ামাটির ভাস্কর্য : ভরত ভায়না

www.pathagar.com

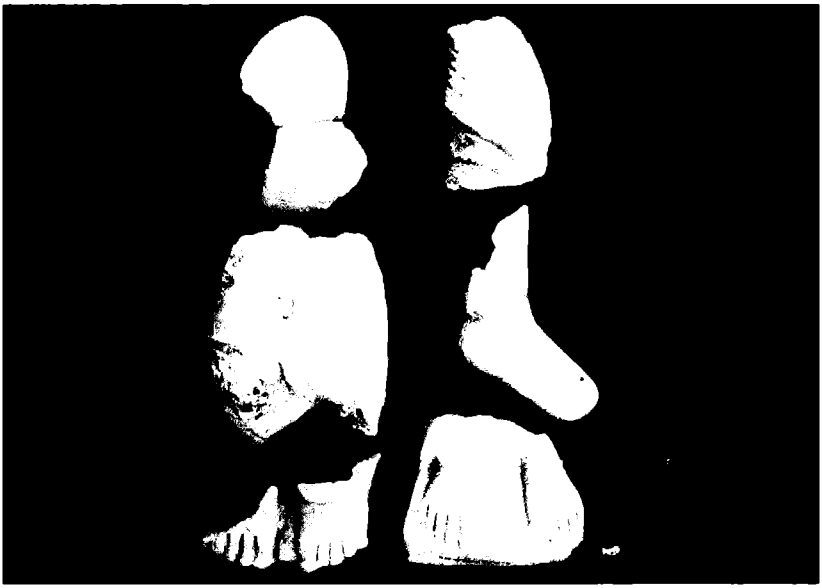

পোড়ামাটির ভাস্কর্যের খণ্ডিত অংশ : ভরত ভায়না

লোহার দ্রব্য : ভরত ভায়না

www.pathagar.com

মৃৎপাত্র : ভরত ভায়না

গৃহপালিত পশুর হাড় : ভরত ভায়না

www.pathagar.com

গোরার মসজিদ : বারবাজার

www.pathagar.com

সাত গাছিয়া আদিনা মসজিদ : বারবাজার

www.pathagar.com

ষাটগম্বুজ মসজিদ : পাথরের স্তম্ভ ইটের আবরণে ঢেকে ফেলা হয়েছে

ষাট গম্বুজ মসজিদের অভ্যন্তর : প্লাস্টার আর চুনকাম করে সুলতানি যুগের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে ফেলা হয়েছে

www.pathagar.com

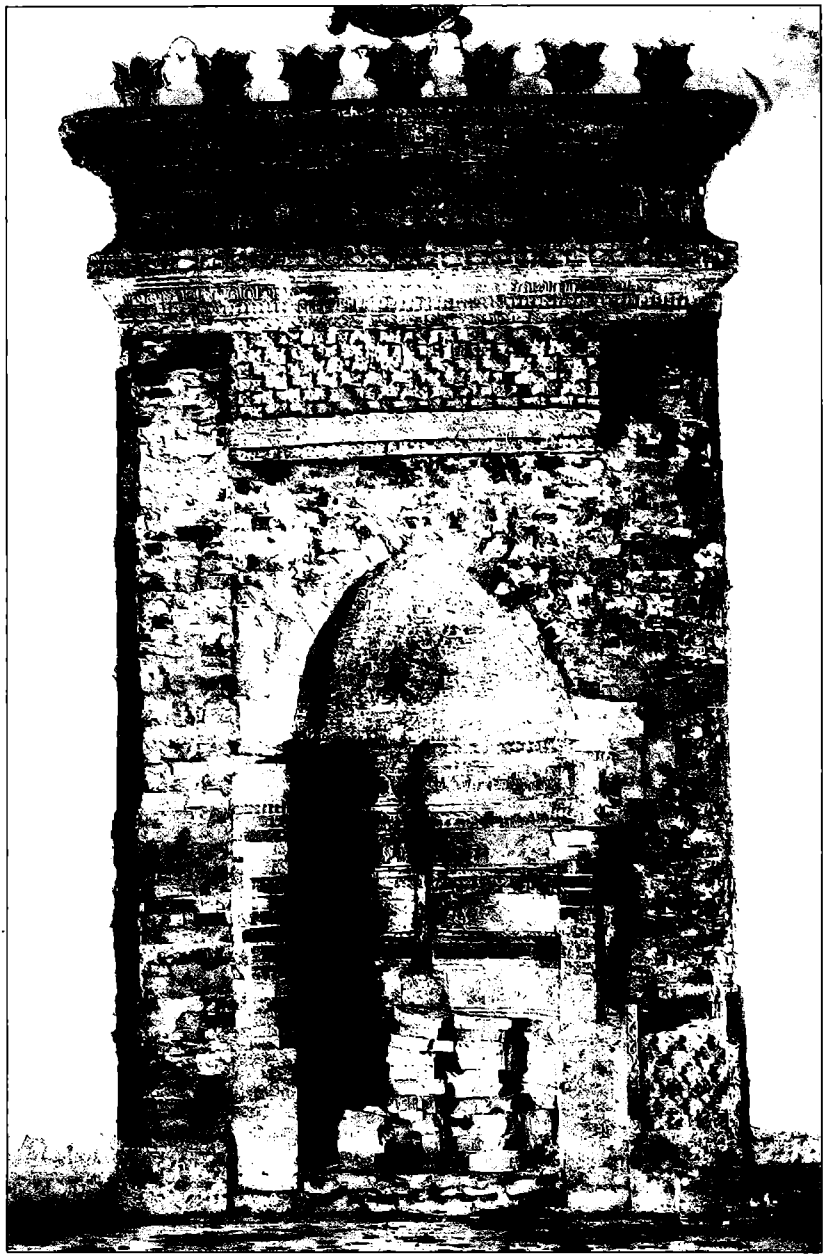

ষাটগম্বুজ মসজিদের উত্তর মিহরাব : সংস্কারের আগে

www.pathagar.com

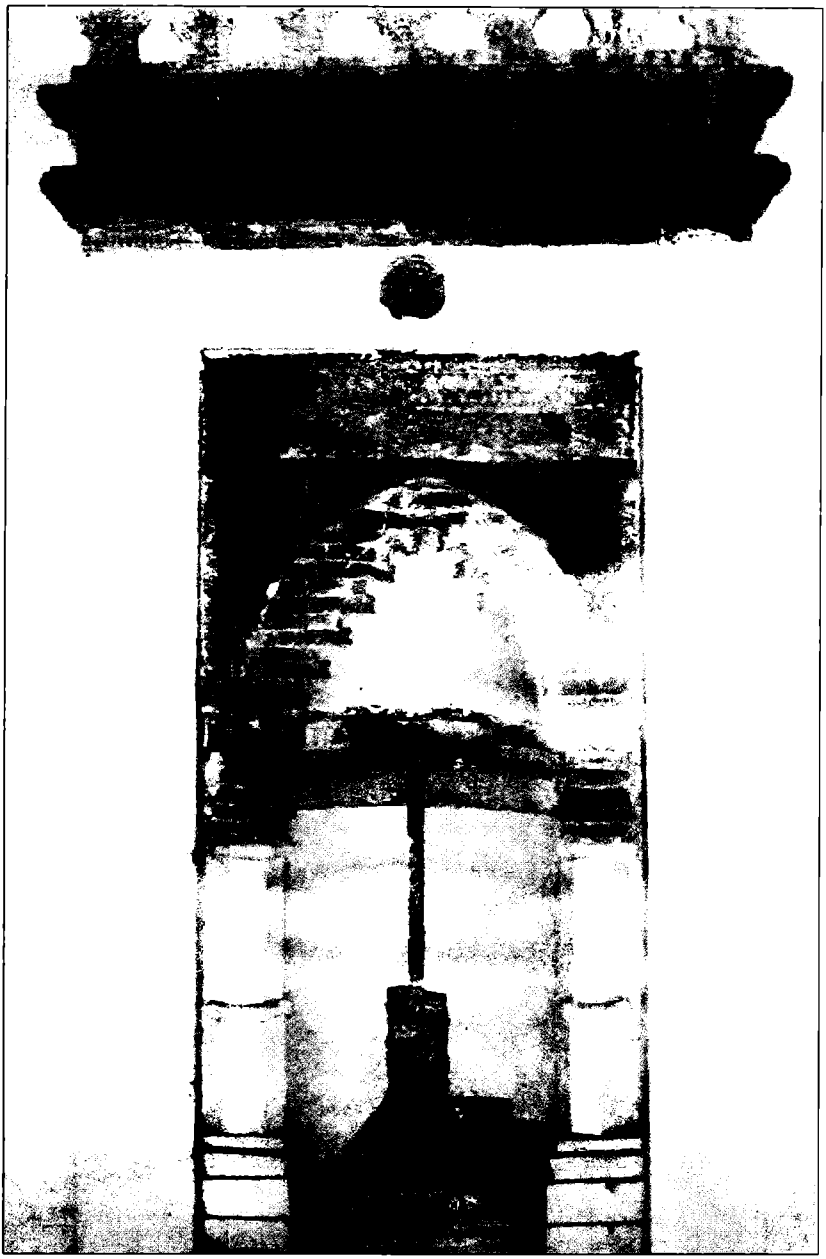

সংস্কারের পর অলঙ্করণ নষ্ট করে ফেলা হয়েছে

www.pathagar.com

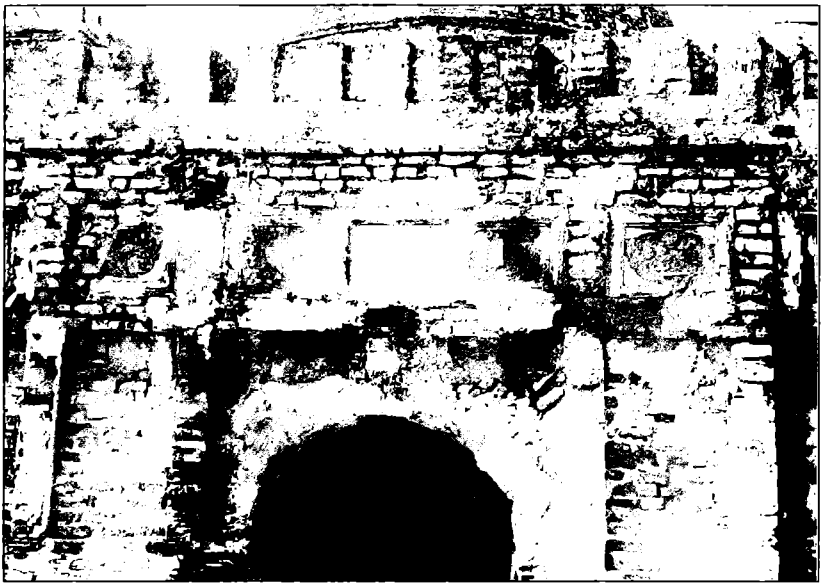

বাঘা কমপ্লেক্সে মোগল মসজিদ

শনাক্তকৃত বাঘা মাদ্রাসা অঞ্চলের একাংশ

www.pathagar.com

টোল ইমারত, মনসাবাড়ি

মনসামন্দির, মনসাবাড়ি

www.pathagar.com